মধুময়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রকাশক ঃ
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩
প্রচ্ছদপট ঃ
গৌতম রায়
প্রচ্ছদ ব্লক ঃ
সি. বি এইচ. প্রেসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২
মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুনীল কুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্ষয় তৃতীয়া ঃ ১৩৬৮

উৎসর্গ

শ্যামল মজুমদার

প্রিয়বরেষু

তুমি আর কখনো এসো না!

মধুময় টেবিলে কনুইয়ের ওপর থুতনি রেখে যেমন ভাবে বসে ছিল, সেই রকমই রইল, একটুও চমকে উঠল না, একটাও কথা বলল না। আসলে সে মনে মনে ব্যাকুল ভাবে বলতে চাইল, আমি পারব না! স্বপ্না, কেন আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ?

সে নিঃশব্দে স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

স্বপ্না বলল, তুমি কি চাও আমি আত্মহত্যা করি?

মধুময় এখনও চুপ।

কেন দিনের পর দিন আমাকে এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলছ? যে সম্পর্ক একবার ভেঙে যায়, তাকে আর জোর করে জোড়া লাগানো যায় না। আমি ওপরে গেলেই মা আমাকে বকুনি দিয়ে একেবারে ভাজা-ভাজা করবে। আমার দাদা-টাদারা শেষকালে যদি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়, সেটা কি ভালো হবে?

মধুময় একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ঠিক আছে, আমি এখানে আর আসব না, কিন্তু বাইরে কোথাও—

না, তাও সম্ভব নয়। আমি ও রকম ভাবে কিছু চাই না, বাড়ির লোককে কিছু না জানিয়ে, লুকিয়ে, গোপনে—ওটা আমার স্বভাব নয়।

মাসে অন্তত একবার?

কেন তুমি অবুঝের মতন কথা বলছ? আমি যা পারব না, সে সম্পর্কে জোর করে কোন লাভ আছে?

তুমি এক সময় বলেছিলে···

তারপর কত কী বদলে গেছে।

আবার সব কিছু বদলে নেওয়া যায় না, আমি যদি সেই আগের মতন—

তা হয় না। তুমিও জানো, তা হয় না। সাড়ে চারটে বাজল, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

মধুময় উঠে দাঁড়াল। তার লম্বা শরীরটার জন্য সে বিব্রত, এই রকম মুখের ভাব। কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে আছে। মাটির দিকে চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আর আমি কোন দিন আসব না?

স্বপ্না বলল, তোমারও তো একটা আত্মসম্মান আছে, যেখানে কেউ তোমাকে চায় না, সেখানে কেন তুমি আসবে?

তুমিও চাও না?

স্বপ্না মধুময়ের ডান বাহুতে বাঁ হাতটা ছোঁয়াল। এর আগে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে মধুময় যে ক'বার স্বপ্নাকে ছুঁতে গেছে, সেই ক'বারই স্বপ্না এমন ভাবে ছটফটিয়ে দূরে সরে গেছে যেন মধুময় একজন মেথর, এক্ষুনি কমোড পরিষ্কার করে এলো।

আজ স্বপ্না নিজেই ছুঁয়ে দিল মধুময়কে। যেখানে সে হাত রেখেছে সেই জায়গাটা যেন জ্বলছে।

তোমাকে তো বুঝিয়ে বললাম, আমাদের পুরোনো সম্পর্ক আর নেই।

আচ্ছা, আমি আর আসব না।

স্বপ্না মধুময়ের বাহুতে আর একটু চাপ দিল, গলার আওয়াজ আরও নরম করে বলল, লক্ষ্মীটি, শুধু শুধু মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখো না, আমাকে ছাড়াও তুমি জীবনে অনেক কিছু করতে পারো—

মধুময় স্থির চোখে তাকিয়ে রইল স্বপ্নার দিকে। এক সময় কোন কথা না বলে শুধু চোখে চোখেই অনেক কথা হয়ে যেত। কিন্তু স্বপ্না চোখ ফিরিয়ে নিল। মধুময় জানে, স্বপ্নার মনটা ফুলের মতন কোমল। ফুলও এক এক সময় কঠিন হতে পারে।

মধুময় আর কিছু না বলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। এই বৈঠকখানা ঘরের সামনেই একটা লম্বা বারান্দা। তার শেষ প্রান্তে, কয়েকটা সিঁড়ির পর বাইরের গেট। বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে সে মনে মনে বলতে লাগল, আমি আর এখানে আসব না, আমি আর এখানে আসব না

তার পিঠে যেন একটা গরম হাওয়া লাগছে। যেন কার নিঃশ্বাস। মধুময় তবু তাকালো না পিছন ফিরে। এ কথা ঠিক, স্বপ্না তাকে বিদায় দেবার জন্য গেট পর্যন্ত আসবে না। সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে বসবার ঘরের দরজার সামনে। অত দূর থেকে স্বপ্নার স্বস্তির নিঃশ্বাস কি তার পিঠে লাগতে পারে?

গেট থেকে বেরিয়ে মধুময় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সামনেই ট্রাম স্টপ। মধুময়ের এখান থেকেই ওঠবার কথা। কিন্তু উঠল না, হাঁটতেই লাগল। দুটো হাতই কোটের পকেটে গোঁজা, মাটির দিকে মুখ, সে রাস্তার কিছুই দেখছে না।

বেশ খানিকটা গিয়ে মধুময় থমকে দাঁড়াল। মনে মনে বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে সে বলল, আমি স্বপ্নার মাকে খুন করব। ঐ ভদ্রমহিলা অনেকের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমি স্বপ্নার দাদাকেও খুন করব, কারণ সে আমাকে অপমান করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। এমন কি, স্বপ্নার মেজকাকা যদি উল্টোপাল্টা কথা বলতে আসেন, তাহলে তাকেও খুন করা যেতে পারে।

তারপর মধুময় আবার স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে বলবে, আমি আবার এসেছি। এখন তো আর বারণ করার কেউ নেই!

কোটের পকেট থেকে মধুময় হাত দুটো বের করল। সে পারে, সে অনায়াসেই এই তিনজনকে খুন করে ফেলতে পারে।

তারপর মধুময় হাসল। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? মাকে দাদাকে ছোট কাকাকে খুন করলেই বা স্বপ্না তার কাছে আসবে কেন? একজন খুনীকে কেনই বা সে ভালোবাসবে? ঐ সব প্রিয়জনের চেয়ে কি তার আকর্ষণ বেশী?

তাছাড়া, স্বপ্নার প্রতিটি ব্যবহারেই আজ ফুটে উঠেছিল যে সে নিজেই আর মধুময়কে চায় না। বিশেষত ঐ যে গায়ে হাত ছোঁয়ালে। চরম ন্যাকামি নয়! বাড়ির কুকুরকে বাইরে পাঠাবার সময় গায়ে হাত বুলিয়ে যেমন লোকে বলে, যা যা—সে-রকম ভাবেই স্বপ্না তাকে চলে যেতে বলেছে।

মধুময় আর কোন দিন আসবে না স্বপ্নার বাড়িতে। রাসবিহারী মোড় থেকে লেক মার্কেট পর্যন্ত ট্রাম রাস্তা, এই রাস্তাটুকুতে সে আর পায়ে হেঁটে যাবে না কোন দিন। ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সিতে যেতে হলে সে এইটুকু পথ চোখ বুজে থাকবে। সারা জীবনের মতো এটা ঠিক হয়ে গেল।

ওই জন্যই স্বপ্না ক'দিন ধরে তার লেখা চিঠিগুলো ফেরৎ চাইছিল। আজ আর চায় নি। মধুময়কে তাড়াবার ব্যস্ততায় ভুলে গেছে বোধ হয়। স্বপ্না কি ভেবেছিল যে সে অন্য কাউকে বিয়ে করলে মধুময় ঐ চিঠিগুলো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে পারে? স্বপ্না এ রকমও ভাবতে পারে তার সম্পর্কে?

হ্যাঁ, ভাবতে তো পারেই। মানুষ একবার খারাপ কাজ করলে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার করাও তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।

দেশপ্রিয় পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে মধুময় একটা সিগারেট ধরালো। এবার সে কি করবে? এখন মানে এই মুহূর্তে নয়—বাকি জীবনটা?

তার চোখের সামনে যেন চলচ্ছবির মতন ফুটে উঠল তার গত কয়েক বছরের জীবনের ঘটনা। এই ঘটনাগুলো সে ভুলতে চায়, কিন্তু কেউ তাকে ভুলতে দেবে না। সে আশা করেছিল স্বপ্না অন্তত তাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে। দুজনে মিলে আবার একটা নতুন জীবন শুরু করবে।

পার্কের রেলিং-এর পাশে দাঁড়ানো মধুময় যেন একটা পাথরের মূর্তি।

* * *

গত দু'বছর মধুময় একটা দারুণ ভুলের মধ্যে ডুবে ছিল। এর মধ্যে জেল খাটতে হয়েছে ছ'মাস। তাও কোন রাজনৈতিক কারণে নয় যে গর্ব করে বলা যাবে।

সি. আই. টি. রোডে এক সময় স্বপ্নাদের বাড়ি আর তাদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি। স্বপ্নার বাবা সরকারি চাকরি ছেড়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঢুকেই উন্নতি করতে লাগলেন হু হু করে। তারপর ঝাঁ করে একটা গোটা বাড়ি কিনে উঠে গেলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে।

মধুময় ধরেই নিয়েছিল, স্বপ্নার সঙ্গে তার চিরকালের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এই ধরে নেওয়াটাই তার প্রথম ভুল। সচরাচর এ রকম হয় না।

বি-এসসি পাশ করে মধুময় এম-এসসি-তে ভর্তি হবার সুযোগ পেল না কলকাতায়। একটা সীট পাওয়া গিয়েছিল পাটনা ইউনিভার্সিটিতে। তার বাবা সেইখানেই ভর্তি করে দিয়ে এলেন মধুময়কে।

কোন ক্রমে দাঁতে দাঁত চেপে দু'বছর সময় কাটিয়ে দিয়ে এম-এসসি পরীক্ষা দেওয়া উচিত ছিল মধুময়ের। কিন্তু পাটনায় কিছুতেই মন টিকল না তার, ছ' মাসের মাথায় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলো কলকাতায়। সেটা মধুময়ের দ্বিতীয় ভুল।

সে ভেবেছিল, শুধু শুধু এম-এসসির জন্য দুটো বছর নষ্ট করে কী লাভ। আসল উদ্দেশ্য তো চাকরি! চাকরির জন্য বি-এসসিও যা এম-এসসিও তাই। কলকাতায় ফিরে সে চাকরির জন্য উঠে পড়ে লাগল। অর্থাৎ এই শহরের আট দশ লাখ বেকারের মধ্যে ডুবে গেল সে।

বাড়ি বদল করলেও স্বপ্নার সঙ্গে তার দেখা হত প্রায় রোজই। গোড়ার দিকে পাটনা যাবার পর স্বপ্না তাকে চিঠি লিখত নিয়মিত। মধুময়ের চিঠি লেখার ব্যাপারে বড় আলস্য। স্বপ্নার তিনখানা চিঠির উত্তরে সে লিখত একটা। স্বপ্নার চিঠি পাঁচ পাতা তো মধুময়ের

দেড় পাতা। কিংবা, চিঠিতে কিছু লেখার বদলে মধুময় একটা দুটো ছবি এঁকে পাঠাত।

মধুময় ভেবেছিল এক বছরের মধ্যে সে নিশ্চয়ই একটা চাকরি পেয়ে যাবে, তারপর আর এক বছর সময় লাগবে সবকিছু ঠিকঠাক করে নিতে। তখন সে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বিয়ে করবে স্বপ্নাকে।

কিন্তু চাকরি পাবে কি, কখনও কখনও ইন্টারভিউ পেলেও মধুময়ের যেতে ইচ্ছে করত না। বাবা-কাকা মেসো-পিসের চেনাশুনো বা ধরাধরির সূত্রে কয়েকবার এ রকম ইন্টারভিউ পেয়েছে মধুময়। কিন্তু সে বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টেছে। সাড়ে তিনশো, চারশো টাকা মাইনে—এই সামান্য টাকার চাকরি পেয়েই বা কী লাভ? এই টাকায় আজকাল দুখানা ঘরের বাড়িও ভাড়া পাওয়া যায় না।

স্বপ্না বলেছে, প্রথমেই বুঝি কেউ বেশী মাইনে দেয়? চাকরিতে ঢুকলে দু-এক বছর পর নতুন গ্রেড, নতুন স্কেল দেবে।

স্বপ্নাদের বাড়ির বৈঠকখানায় দুপুরবেলা শুয়ে থেকেছে মধুময়, তার পকেটে ইন্টারভিউয়ের চিঠি। সে হাসতে হাসতে বলেছে, জানো, ইন্টারভিউয়ের জন্য সকাল সাড়ে ন'টায় যেতে বলে, তারপর বসিয়ে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো ডাক পড়ে সেই চারটে সাড়ে চারটের সময়·····আমার খুব খিদে পেয়ে যায়।

স্বপ্না হেসে বলেছে, ঠিক আছে, আমি দুপুরবেলা টিফিন কৌটায় করে তোমার জন্য খাবার নিয়ে যাব।

মধুময় বলেছিল, অন্য ক্যাণ্ডিডেটরা তোমাকে দেখে সিটি দেবে।

তাহলে—কথাটা শেষ না করে স্বপ্না তার ছোট্ট হাত ব্যাগটা খুলে দুটো দশ টাকার নোট বের করে বলেছে, তোমার কাছে রাখ।

ও পাড়ার একটি বাচ্চাদের স্কুলে স্বপ্না তখন সকালবেলা পড়াতে শুরু করেছে। তার নিজস্ব রোজগার আছে। স্বপ্নার কাছ থেকে ঐ টাকা নেওয়াটা হয়েছিল তার তৃতীয় ভুল।

স্বপ্না বলেছিল, তোমার উচিত ছিল আর্টিস্ট হওয়া। কেন তুমি সায়েন্স পড়তে গেলে?

এই কথাটা শুনলেই মধুময় লজ্জা পায়। মধুময়ের ছবি আঁকার হাত আছে। সে কোথাও শেখে নি। ছোটবেলা থেকেই তার ছবি আঁকার শখ। আত্মীয় স্বজনরা সবাই প্রশংসা করেছে তার ছবি দেখে। স্বপ্নার ছবি সে এঁকেছে অনেকগুলো, কিন্তু মধুময় জানে, আত্মীয় স্বজনের বা বান্ধবীব প্রশংসা পেলেই কেউ আর্টিস্ট হয় না। এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করা দরকার। ছবি আঁকা সারাদিনের কাজ। খরচও অনেক। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে শিল্পী হবার ঝুঁকি সে নিতে পারে নি। তাকে শখের শিল্পী হয়েই থাকতে হবে।

বেকার অবস্থায় বেশ বড় কয়েকটি প্রলোভনের মধ্যে পড়তে হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বখাটে হয়ে যাওয়া। মধুময় হঠাৎ পাড়ার বেকাব বখাটেদের দলে ভিড়ে গেল। বখামির একটা দারুণ নেশা আছে তো। সব সময়ই কিছু না কিছু উত্তেজনা। এ পাড়া ও পাড়ায় ঝগড়া, মারামারি, রবারের কারখানার পিছনের মাঠে সন্ধ্যের পর লুকিয়ে লুকিয়ে মদ্যপান, ন।ীদের বিষয় জমকা.লা আলোচনা। প্রত্যেকটিই ধাপে ধাপে এগোয়।

আর্ট স্কুলে ভর্তি না হয়ে সায়েন্স পড়তে যাওয়া যেমন মধুময়ের চরিত্র বিরোধী কাজ হয়েছিল, তার চেয়েও বেশী চরিত্রবিরোধী কাজ সে করতে লাগল এই নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে। যে মধুময় ছিল লাজুক, নম্র একটি ছেলে, সে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার ছোটখাটো গুণ্ডাদের মধ্যে বেশ নাম করে ফেলল। তার লম্বা চেহারা, চুল বড় বড়, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করলে এবং গলায় একটা রুমাল বাঁধলে তাকে গুণ্ডার ভূমিকায় বেশ মানিয়েও যায়।

স্বপ্নার সঙ্গে এই সময়টায় কম দেখা হতে লাগল। দেখা হলেও স্বপ্না তার এই পরিবর্তিত ভূমিকা কিছু বুঝতে পারে না। স্বপ্না অভিমান করে। মধুময় তখন চমৎকার মিথ্যে বলতে শিখেছে, সেই সব মিথ্যে দিয়ে সে স্বপ্নাকে ভোলায়।

স্বপ্নার সঙ্গে তখন দেখা হত সকালে বা দুপুরে। সন্ধ্যের পর একদিও নয়। সন্ধ্যের পর মধুময় অন্য মানুষ।

মধুময়ের সেই বখাটে দলের আর একজনেরও কোন মেয়ে বন্ধু ছিল না। কেউ ভালোবাসা পায় নি। তাই তারা সর্বক্ষণ মেয়ের শরীর নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত। মধুময়ের তো সে রকম কোন অভাব ছিল না। তবু কেন সে ঐ আলোচনায় বেশী মজা পেতে লাগল সেটা একটা রহস্য। মেয়েদের বিষয়ে আলোচনা করার বদলে সে তো স্বপ্নার সঙ্গেই সময় কাটাতে পারত খুব সুন্দর ভাবে। অথচ সে স্বপ্নার কাছে না গিয়ে বসে থাকত ঐ বন্ধুদের সঙ্গে। হয়তো যে কোন সুন্দর জিনিস সম্পর্কেই তার আক্রোশ জন্মে গিয়েছিল। ছবি আঁকা একদম ভুলে গিয়ে সে উপভোগ করত বন্ধুদের অশ্লীল রসিকতা।

মধুময় তখন ঠিক যেন একটা দ্বিতীয় গুপ্ত জীবন কাটাচ্ছিল। সে সম্পর্কে স্বপ্না কিছু জানে না। তার বাড়ির কেউই কোন সন্দেহ করে নি। মধুময়ের বাবা বাড়িতে থাকেন খুবই কম সময়, ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তিনি মনোযোগ দিতে পারেন না। শুধু মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার একটু আগে স্ত্রীকে বকাবকি করেন খানিকটা।

ছেলেটা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এ রকম বেকার হয়েই থাকবে—সারাদিন কি করে সে?

মধুময়ের মা তাড়াতাড়ি ছেলের দোষ চাপা দেবার চেষ্টা করেন নানা কথা বলে।—চাকরির জন্যে তো হন্যে হয়ে ঘুরছে সারাদিন। চাকরি কি আজকাল গাছে ফলে?

এতগুলো জায়গায় আমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করলাম ওর জন্য, কোথাও তো ইন্টারভিউয়ে ভালো করতে পারে না। এবার না হয় আমাদের অফিসেই বড় সাহেবকে বলে দেখব···

মধুময়ের বাবা কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নিজের অফিসে বড় সাহেবকে বলে একটা ছোটখাটো চাকরির ব্যবস্থা করে ফেললেন। কিন্তু সে চাকরিও প্রত্যাখান করল মধুময়।

সরাসরি বাবার সঙ্গে কথা না বলে, মাকে সে জানিয়ে দিল, বাবার সঙ্গে সে এক অফিসে চাকরি করবে না। তাতে বাবারও অসুবিধে

হবে, তার নিজেরও অসুবিধে হবে। অফিসের লোকেরাও এ ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না।

মধুময়ের বাবা এ কথা শুনে আরও রাগ করলেন। স্ত্রীকে তিনি জানিয়ে দিলেন ছেলে যা খুশি করে করুক। দু'দিন বাদে আমি যখন চোখ বুজব আর সংসারটা ওর ঘাড়ে পড়বে, তখন বুঝবে ঠ্যালা।

মধুময়ও তার মাকে জানিয়ে দিল, তিন মাসের মধ্যেই যে কোন ভাবেই হোক, একটা উপার্জনের পথ সে খুঁজে নেবে। এ জন্য বাবাকে চেষ্টা করতে হবে না। সে নিজেই পারবে।

বেকারেরও হাতখরচ লাগে, আড্ডার সময় বেকারদেরও পয়সা খরচ হয়। মধুময় তখন যাদের সঙ্গে মিশছিল, তারা অনেকেই তার চেয়ে বয়েসে যথেষ্ট বড়, এবং পাঁচ ছ' বছর ধরে বেকার। তবু কোন্ অত্যাশ্চর্য উপায়ে তারা পয়সা যোগাড় করত তা মধুময় জানে না। কিন্তু তার নিজের বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মায়ের কাছ থেকে আর প্রত্যেক দিন পয়সা চাওয়া যায় না। স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হলে মধুময় বলত, দেখি তুমি কত পয়সা জমালে—তারপর স্বপ্নার হাত-ব্যাগটা খুলে বলত, তোমার কাছ থেকে আবার পনেরো টাকা ধার নিলাম। সব শোধ করে দেব একসঙ্গে!

মধুময়ের ছোট বোন রুমি শুধু একদিন তাকে বলেছিল, হ্যাঁ রে দাদা, তুই আজকাল রতনদের দলের সঙ্গে মিশছিস? আমাদের কলেজের সামনে দেখলাম তোরা একটা ট্যাক্সি করে যাচ্ছিস·····

রুমি পড়ে লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে। গতকাল সত্যিই ঐখান দিয়ে মধুময়রা গিয়েছিল একটা ট্যাক্সিতে। মধুময় অস্বীকার করতে পারল না।

কেন, ওদের সঙ্গে মিশলে কী হয়েছে?

ওরা তো সব ক'টা বাজে ছেলে। তোর সঙ্গে রুচিতে মেলে?

কে বলেছে বাজে ছেলে?

ওরা সব সময় খারাপ খারাপ কথা বলে, মেয়েদের দেখলে সিটি দেয়···

তোকে দেখে কোন দিন খারাপ কথা বলেছে কিছু ?

বখাটে ছেলেদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা অলিখিত নিয়ম আছে। তারা কখনো সেমসাইড করে না। নিজেদের দলের কারুর আত্মীয়-বা চেনা মেয়েদের ওরা বলে সেমসাইড।

মধুময় বলল, লোকের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না তারা ভালো কী খারাপ। ওরা মোটেই খারাপ ছেলে নয়, বেকার বলে সবাই ওদের অবজ্ঞা করে, ওরা কি ইচ্ছে করে বেকার হয়ে আছে ?

বেকার হলেই বুঝি বখাটে হতে হবে ? তুই ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে স্বপ্নাদিকে বলে দেব।

স্বপ্না সম্পর্কে সবাই একটা কথা জানে। স্বপ্না একদম মিথ্যে কথা বা কোন রকম খারাপ কথা সহ্য করতে পারে না। ছেলেরা দূরে যাক, কোন মেয়েও স্বপ্নার সামনে কোন অসভ্য কথা বললে, স্বপ্না সেখান থেকে রাগ করে উঠে যায়। মধুময়ের সঙ্গে স্বপ্নার এতদিনের পরিচয়, কিন্তু মধুময় এখন পর্যন্ত একবারও স্বপ্নাকে চুমু খায় নি। বিয়ের আগে স্বপ্না ও সব ব্যাপার কল্পনাই করতে পারে না।

মধুময় এমন ভাবে রুমির দিকে তাকিয়ে ছিল যেন রুমি যদি সত্যিই স্বপ্নার কাছে এ ব্যাপারে কোন নালিশ করে, তাহলে সে রুমিকে ভস্ম করে ফেলবে !

লম্বা চওড়া চেহারার জন্য মধুময়কে খুব পছন্দ করে রতন। প্রায়ই সে মধুময়ের পিঠ চাপড়ে বলে, এ ছেলেটাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। এ রকম একটা এক নম্বরী ছেলে কেরাণীগিরির জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল, এ কথা ভাবা যায় মাইরি ! এ ছেলের তো রাজা হবার কথা !

মধুময়ের সাহস পরীক্ষা করবার জন্য একদিন সন্ধ্যেবেলা কার্জন পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে রতন বলল, ঐ যে মোটা মতন লোকটা যাচ্ছে তুই ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারিস মধুময় ?

মধুময় অবাক হয়ে বলেছিল, কেন ? ওকে ফেলে দেব কেন ?

রতন বলেছিল, সে কথা জানবার তোর দরকার নেই। লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েই ইডেন গার্ডেনের দিকে ছুটে পালাবি। যদি ধরা না পড়িস, তাহলে বুঝব, তুই বাহাদুর।

আর যদি ধরা পড়ি ?

তখন উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবি। এমনিতে লোকের সঙ্গে রাস্তা ঘাটে ধাক্কা লেগে তো যায়ই। আর যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়—

পুলিশে ধরবে কেন ?

ধরবে না, কথার কথা বলছি। তবু যদি ধরে তুই তখন কিন্তু আমাদের কারুর নাম বলবি না। তা হলে বুঝব তোর হিম্মৎ।

লোকটির মুখ ভর্তি পান, বাতাবী লেবুর মতন গোল মুখের মধ্যে চোখ দুটো অতি লোভীর মতন। দেখলেই মনে হয়, লোকটা সারাদিন স্বার্থ চিন্তা করে। মানুষ ঠকানোই ওর পেশা। লোকটার হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ।

উল্টো দিক দিয়ে হেঁটে গিয়ে মধুময় লোকটির সামনে থমকে দাঁড়াল। অনেক সময় এ রকম হয়, দুজন লোক মুখোমুখি পড়ে যায়, একজন ডানদিকে সরলে অন্যজনও ডানদিকে সরে, আবার দুজনই বাঁদিকে। সেই রকম অবস্থায় মধুময় লোকটিকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল। লোকটিকে দেখেই সে খুব অপছন্দ করেছিল বলে ল্যাংটা বেশ জোরেই কষাল।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। হাতের ব্যাগটা ছিটকে গেল।

মধুময় যেন দেখতেই পায় নি, এইভাবে এগিয়ে গেল। তারপর রাজভবনের পাশ দিয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে সে ছুটে গেল ইডেন গার্ডেনের দিকে।

* * *

পরের দিন রতন বলল, লোকটার ব্যাগে দেড় হাজার টাকা ছিল মাত্তর। এই নে তোর শেয়ার, চারশো টাকা!

মধুময়ের হাত কাঁপছিল।

রতন বলেছিল, কী রে, ভয় পাচ্ছিস? লোকটা বড়বাজারে ব্যবসা করে। এই দেড় হাজার টাকা তো ওর কাছে হাতের ময়লা। সর্ষের তেলের দাম কেজিতে আট আনা বাড়িয়ে দিলেই ওদের দিনে দশ হাজার টাকা রোজগার! জানিস!

অপরাধবোধকেও অতিক্রম করে গেল নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ। একটা বদমাশ লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এই হিসেবে ব্যাপারটাকে নিল মধুময়। যেন সে একটা ছোটখাটো রবিনহুড। গভর্ণমেণ্ট তো এই সব ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেবে না। আমরাই দেব।

স্কুল কলেজে পড়ার সময়েও মধুময় কখনো গুণ্ডামি মারামারি করে নি। তার স্বভাবটাই ছিল নরম। বলশালী চেহারা হলেও অনেকে তাই তাকে বলত মেয়েলি ছেলে। এখন মধুময় প্রমাণ করে দিল, সে মোটেই মেয়েলি নয়। এই নতুন ভূমিকায় সে বেশ উত্তেজনা বোধ করল।

টাকাটা পাবার পর সে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, তোমার কাছ থেকে সব শুদ্ধু কত টাকা ধার নিয়েছিলাম যেন? পঁচাত্তর টাকা না? এই নাও!

স্বপ্না অবাক হয়ে বলেছিল, তুমি চাকরি পেয়ে গেছ? কই, আমাকে বল নি তো!

মধুময় বলেছিল, না, চাকরি পাই নি এখনো। তবে, শিগগিরই কিছু করব।

তাহলে কোথায় পেলে টাকা?

মধুময় চটেছিল। সে পুরুষ মানুষ, সে কেন একটি মেয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে টাকা কোথা থেকে পেল? স্বপ্না রোজগার করতে পারে, আর সে পারে না! বেকার বলে কি স্বপ্নাও তাকে অবজ্ঞা দেখাতে শুরু করেছে?

সে জোর করে স্বপ্নার ব্যাগে গুঁজে দিল পঁচাত্তর টাকা। গঙ্গার ধারে রেস্তোরাঁয় গিয়ে আরও খরচ করে ফেলল কুড়ি টাকা, স্বপ্না খেতে চায় না, তবু সে জোর করে খাওয়াবেই।

স্বপ্না তবু বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল টাকাটার কথা। সে জানতে চায় মধুময় হঠাৎ এমন বড়লোক হয়ে উঠল কী করে। তার কাছে মধুময় কোন কিছুই গোপন করে না, স্বপ্নার এ রকম ধারণা, সুতরাং টাকা পাওয়ার ব্যাপারটাই বা বলবে না কেন? কিন্তু টাকার প্রসঙ্গ উঠলেই চটে যাচ্ছিল মধুময়।

দ্বিতীয় কাজটিও মধুময় বেশ সার্থক ভাবেই করল। কাজ বেশ সোজা, কোন একটি লোককে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া। মধুময় নিজের হাতে টাকা পয়সা লুঠ করে না। সে ভার রতন আর দুজন সঙ্গীর। সে শুধু একটি লোককে রাস্তায় ফেলে দেয়। এবং দ্বিতীয়বারেও সে লোকটিকে দেখিয়ে দিয়েছিল রতন, তারও চেহারার মধ্যে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতার ছাপ। মানুষের রক্ত নিংড়ে নেওয়াই যেন ওর কাজ। এই সব লোকের নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়া উচিত। তাই রীতি মতন ঘৃণার সঙ্গেই লোকটিকে ফেলে দিয়েছিল মধুময়।

দ্বিতীয়বার পেল সে মাত্র সাতাশ টাকা। রতন খুব আফশোষের সঙ্গে বলেছিল, ও শালা মহা কঞ্জুষ। অত বড় পেট মোটা ব্যাগের মধ্যে রেখেছিল মাত্র একশো তিরিশ টাকা। শালা।

ব্যাগে সত্যিই কত টাকা ছিল, সেটা জানবার উপায় নেই মধুময়ের। সেটা রতন যা বলবে, তা-ই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু মধুময় জানে, দলপতিকে অবিশ্বাস করতে নেই। তাছাড়া, কাজটাই তার খুব ভালো লাগছে, সে কিছু খারাপ লোককে শাস্তি দিচ্ছে। টাকাটাই তো প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু এই টাকাটা পকেটে রাখলেই যেন মধুময়ের পকেট জ্বলতে থাকে। তক্ষুনি ইচ্ছে করে খরচ করে ফেলতে। মধুময়ের অন্তত দুটো গেঞ্জি কেনার দরকার, সে কথা মাকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। কিন্তু নিজের রোজগার করা টাকা দিয়েও সে গেঞ্জি কিনল না। ছুটে চলে গেল স্বপ্নার কাছে। যাওয়ার পথে একটা দোকান থেকে কিনে নিয়ে গেল রাজশেখর বসুর রচনাবলীর একটি খণ্ড। স্বপ্না একদিন বলেছিল, রাজশেখর বসুর বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। খুব পড়তে ইচ্ছে করে।

উপহারটা পেয়ে খুশি হয়েছিল স্বপ্না। কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছিল, তোমার কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে আজকাল!

মধুময় চমকে উঠে বলেছিল, কই, না তো! তুমি কী পরিবর্তন দেখলে?

কী রকম যেন একটা ছটফটে ভাব! এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারো না! আগে তো এ রকম ছিলে না।

মধুময় হেসে বলেছিল, বেকাররা একটু ছটফটেই হয়।

নিজেকে সব সময় বেকার বোলো না তো! আমার শুনতে ভালো লাগে না!

আমি আর বেশীদিন বেকার থাকব না অবশ্য।

কোথাও চাকরি পাচ্ছ বুঝি?

চাকরি ছাড়া বুঝি পুরুষ মানুষ আর অন্য কোন কাজ করতে পারে না?

খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল।

মধুময় আজকাল অধিকাংশ সময়েই বাড়িতে থাকে। আগে থাকত না। বেকার ছেলেদের পক্ষে বাড়িতে বসে থাকা একটা লজ্জার ব্যাপার। খেয়ে দেয়ে রোজ দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হওয়া বেকার

ছেলেদের পক্ষে বড়ই বেমানান। লোকে তাতে আরও বেশী উপহাস করে। বেকাররা রোগা হবে, তাদের চোখের কোণে কালি থাকবে, মেজাজ হবে খিটখিটে, এটাই যেন স্বাভাবিক। যেন দেখলেই বেকার বলে চিনতে পারা যায়। পরিচ্ছন্ন পোশাক, পরিপাটি ভাবে চুল আঁচড়ানো, সুন্দর চেহারার বেকার দেখলে বাকি সব লোকদের কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

মধুময়ও আগে বোতাম খোলা শার্ট আর রবারের চটি পরে, চুল না আঁচড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। দুপুরবেলা নাকে মুখে কোন রকমে খানিকটা ভাত গুঁজে খুব ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কোন পার্কে গিয়ে শুয়ে থাকত গাছের ছায়ায়।

চাকরি পাওয়াটাই বড় কথা নয়, সব সময় এমন একটা ভাব দেখাতে হবে যেন চাকরির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা হচ্ছে। আর চাকরির চেষ্টা মানে তো শুধু দরখাস্ত লেখা নয়, গুরুত্বপূর্ণ লোকদের ধরাধরি করা।

কিন্তু মধুময় আর দুপুর রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করা ছেড়ে দিয়েছে। সে দুপুরে ঘুমোয় না অবশ্য, বই পড়ে কিংবা ছবি আঁকে।

মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, কিছু সুবিধে হল রে, খোকা? তোর বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন।

মধুময় করুণ মুখ করে বলে, দ্যাখ মা, চাকরি নেই বলে রোজ লোকের কাছে অপমান সইতে পারব না। হাজার হোক ভদ্দরলোকের ছেলে। চাকরি যেদিন হবার সেদিন হবেই। তার আগে রোজ রোজ লোকের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করা—

মা চুপ করে যান। এটা যে মধুময়ের একটা নতুন কায়দা সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। এমন কি ঐ করুণ মুখ ভঙ্গিটাও অভিনয়। মধুময়ের নতুন খেলার পক্ষে এটা খুব দরকারি।

শতকরা নিরানব্বইজন প্রৌঢ়ার মতন মধুময়ের মা-ও নিয়তিতে বিশ্বাস করেন। সুতরাং, চাকরি যেদিন হবার সেদিন হবেই, এই কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। মধুময়ের বাবা এখনো ভালো

চাকরি করছেন, সংসারে খুব একটা অনটন নেই। তবে ছেলে পড়াশুনা শেষ করে বেকার বসে আছে, এটাই যা লজ্জার ব্যাপার। তিন বছর হয়ে গেল।

বেকার ছেলেদের প্রেম করতে নেই। অন্তত প্রকাশ্যে। আগে মধুময় স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করতে যেত গোপনে গোপনে। কিন্তু এখন সে ইচ্ছে করেই সবাইকে জানিয়ে দেয় স্বপ্নার কথা। এটাও তার নতুন কৌশল।

সকালবেলা সে তার বোন রুমিকে বলে, তোর কাছে মেঘদূতের কোন অনুবাদ বই আছে? একবার দিস তো, স্বপ্না চাইছিল। অর্থাৎ সে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিতে চায় যে আজ সে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

সপ্তাহে তিনদিন স্বপ্না গানের ক্লাসে যায়। ওর ক্লাস শেষ হয় আটটার সময়। সেই তিনদিন ঠিক আটটা দশে হাজরা মোড়ে দাঁড়ালে দেখা হয় স্বপ্নার সঙ্গে।

কিন্তু মধুময় বাড়ি থেকে বেরোয় দুটোর সময়। মাঝখানে ঘণ্টা পাঁচেক তার অন্য কাজ থাকে। মধুময়ের বাড়ির কেউ তো জানতে পারছে না যে সে স্বপ্নার সঙ্গে ঠিক ক'টার সময় দেখা করতে যাবে। রাস্তায় কিংবা বাড়িতে।

সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে সে চলে আসে শিয়ালদা স্টেশনে। তার নতুন বন্ধুরা কাছাকাছি কোন চায়ের দোকানে অপেক্ষা করে আগে থেকে। এক একদিন এক এক জায়গায়।

এই সময়টায় শিয়ালদা স্টেশনে সাংঘাতিক ভিড়। সবাই দারুণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। কারুর কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে মধুময় তার বন্ধুদের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে অলস ভাবে ঘুরে বেড়ায়। আসলে তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখে যাত্রীদের ওপর। তারপর বেছে বেছে একজনকে ঠিক করে। সেই লোকটির চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। তাকে শুধু সচ্ছল হলেই চলবে না, তাকে নিষ্ঠুরও হতে হবে। দেখলেই যাতে বোঝা যায়

এই লোক অন্য অনেককে ঠকায়। অপরের রক্ত শোষণ করেই সে বেঁচে আছে। কিংবা, এই লোক খাবারে ভেজাল মেশায়, কিংবা বেবী ফুড ব্ল্যাক করে। শুধু চেহারা দেখেই এতখানি বুঝে নিতে হয়।

কোন একটা ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায় সেই সময় কাজ শুরু করে মধুময়। এই সময় একটা দারুণ হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মধুময়ের অন্য বন্ধুরা তখন আলাদা হয়ে গেছে, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মধুময় দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে সেই বেছে রাখা লোকটিকে খুব জোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কাটা এমন ভাবে দিতে হয়, যাতে সে ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে।

প্রথম প্রথম মধুময় ধাক্কা মেরে নিজেও দৌড়ে পালাত। এখন আর তা করে না, সে নিজেই লোকটিকে টেনে তোলে। অন্য লোকরাও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। দু-এক মিনিট সময় লাগে। তার মধ্যেই লোকটির ব্যাগ হাওয়া। বতন কিংবা ধনা ব্যাগটা নিয়ে মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে।

মধুময় লোকটিকে সমবেদনা জানায়। অন্যদের সঙ্গে মিলে সেও ব্যাগটা খোঁজবার ভান করে। তার আগে সে নিজেই লোকটিকে ধমক দেয়—আপনার চোখ নেই মশাই, ট্রেন এসেছে বলে এমন অন্ধের মতন ছুটতে হবে!

মধুময়কে সন্দেহ করার উপায় নেই। তার দুর্দান্ত সুন্দর চেহারা, প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবার মতন সাজ-পোশাক। তার ব্যবহার কত ভদ্র।

স্টেশন থেকে ব্যাগ-ট্যাগ ছিনতাই করে ছিঁচকে চোরেরা। সকলেরই ধারণা, সেই সব ছিঁচকে চোরদের একটা টিপিক্যাল চেহারা আছে। তাদের মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, ইঁদুরের মতন লম্বাটে মুখ আর চঞ্চল চোখ। লোকেরা সেই রকম চেহারার কারুকেই ভিড়ের মধ্যে খোঁজে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হলে মধুময় ট্রেনে উঠে পড়ে। উল্টোডাঙ্গা বা দমদম পর্যন্ত চলে যায়। তারপর সেখানে নেমে আবার উল্টোদিকের

ট্রেন ধরে শিয়ালদা ফিরে আসে। সব মিলিয়ে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার বেশী লাগে না।

মৌলালির মোড় থেকে একটু বাঁদিকে বেঁকলে যে পার্কটা, সেখানে অপেক্ষা করে রতনরা। টাকা পয়সা তক্ষুনি ভাগ হয়ে যায়। লোক চিনতে খুব ভুল না হলে রোজগার হয় বেশ ভালোই। এক একদিন চার-পাঁচ হাজার টাকাও থাকে ব্যাগে। দুশো-আড়াইশোর কমে কোন দিন না।

সপ্তাহে একদিন শিয়ালদায়, পরের সপ্তাহে হাওড়ায়, তার পরের সপ্তাহে ডালহৌসীতে, এবং তারপর একদিন চৌরঙ্গিতে সিনেমা পাড়ায়। মাসে মোট চারদিন কাজ। হাজার বারোশো টাকা হেসে খেলে পাওয়া যায়।

টাকা ভাগাভাগির পর রতন আর ধনারা যায় ফুর্তি করতে। মধুময় কিন্তু আর ওদের সঙ্গে থাকে না। তার অন্য কাজ আছে।

ঠিক আটটা দশে সে পৌঁছে যায় হাজরা মোড়ে। তার মুখে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন নেই।

স্বপ্না এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?

মধুময় হাসি মুখে বলে, অন্তত আধঘণ্টা।

স্বপ্না বলে, তুমি আচ্ছা পাগল! এ রকম ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কী দরকার? বাড়িতে আসতে পারো না? আমি তো রোজ গানের স্কুলে আসি না।

মধুময় বলে, আমার এ রকম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেই ভালো লাগে। ঠিক নতুন প্রেমিকদের মতন মনে হয়।

সেই হাফ প্যান্ট পরা বয়েস থেকে স্বপ্না মধুময়ের বান্ধবী। সবাই জানে, মধুময় একদিন স্বপ্নাকে বিয়ে করবে। একটা ঠিক মতন চাকরি পেলেই হয়।

টাকাগুলো খরচ করাই এক ঝামেলা। স্বপ্না বেশ সচ্ছল পরিবারের মেয়ে হলেও শখ করে পাড়ার একটা মর্নিং স্কুলে পড়ায়। অর্থাৎ তার একটা বৈধ রোজগারের পথ আছে। নিজের খরচ সে

নিজেই চালায়। এবং যেহেতু তার প্রেমিক বেকার, তাই সে ধরেই নিয়েছে যে দুজনে কোন রেস্তোরাঁয় যেতে গেলে স্বপ্নাই ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দেবে।

মধুময় তাতে আপত্তি করে নিজে টাকা দিতে গেলেই স্বপ্না জিজ্ঞেস করে, তুমি টাকা কোথায় পেলে?

মধুময় নিজেই এক সময় স্বপ্নার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। সুতরাং হঠাৎ তার পকেটে অনেক টাকা থাকার ব্যাখ্যা দেওয়া তার পক্ষে সত্যিই শক্ত। তাই সে এক গাল হেসে বলে, আমার রিস্ট ওয়াচটা আজ বিক্রী করে দিলাম।

কেন?

বেকারের হাতে ঘড়ি মানায় না।

যাঃ, বাজে কথা বোলো না। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন বিক্রী করলে?

জিজ্ঞেস করলে তুমি আপত্তি করতে, সেই জন্য।

আমি তোমাকে আর একটা ঘড়ি কিনে দেব।

অথচ মধুময়ের পকেটে তখন অনেক টাকা। একজন বেকারের তুলনায় তো বটেই, তার বয়েসী অনেক ছেলের তুলনাতেই সে বেশ সচ্ছল। পকেটে হাজার খানেকের বেশী টাকা রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে মতন খরচ করার উপায় নেই। একজন বেকার দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে —এ কি কেউ কখনো দেখেছে?

স্বপ্না এত বেড়াতে ভালোবাসে মধুময় ইচ্ছে করলেই ট্যাক্সি ভাড়া করে তাকে নিয়ে চলে যেতে পারে ব্যারাকপুর বা ডায়মণ্ড হারবার। কিংবা আরও দূরে। অবশ্য খুব বেশী দূরে নয়, কারণ সেদিনের মধ্যেই ফিরতে হবে। কোথাও তার সঙ্গে স্বপ্না রাত্রে থাকবে, এ কথা কল্পনাই করা যায় না।

স্বপ্না এখনো ভাবে, বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের সাধারণ আলিঙ্গন চুম্বনও পাপ। স্বপ্নার অসাধারণ সারল্য ও সততার জন্য তার কলেজের বান্ধবীরাও কখনো তাকে তাদের গোপন কথা বলে নি।

এত সরল বলেই স্বপ্নাকে কক্ষণো ঠকাতে ইচ্ছে করে নি মধুময়ের। কিন্তু সে যে কিছুদিন ধরে দু' রকম জীবন যাপন করছে সে-কথা স্বপ্নাকে কিছুতেই জানাতে পারে না।

যদিও মধুময়ের মনে মনে যুক্তির অভাব নেই। সে তো কোন অন্যায় করছে না। তার স্বাস্থ্য ভালো, পড়াশুনোয় মাঝারি, সে তো সৎভাবে থেকে এই দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বেকার আখ্যা দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর।

বাড়ির লোকের অনুরোধে মধুময় ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশও করেছে। প্যানেলে নাম আছে তার। কিন্তু কবে চাকরি হবে কোন ঠিক নেই। তার দু' বছর আগে যাদের প্যানেলে নাম উঠেছিল, তারাও অনেকে চাকরি পায় নি এখনও। এ কী রকম ব্যবস্থা, যেখানে পনেরো হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেবার পর চাকরি পায় মাত্র বাইশজন? বছরের পর বছর এই অদ্ভুত কাণ্ড চলছে। এরই ওপর দেশ টিকে আছে।

মধুময় কেন নিজেকে বঞ্চিত করবে? কেন চব্বিশ বছর বয়সেও তাকে বাবা মায়ের কাছে হাত পেতে ট্রাম বাস ভাড়া কিংবা সিগারেটের খরচ চাইতে হবে? তাই সে কেড়ে নিচ্ছে। যাদের বেশী আছে, কেড়ে নিচ্ছে তাদের কাছ থেকে। চোরের ওপর বাটপাড়ি করাটা কি একটা অপরাধ? মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন। সেই সময়টা তারা বঞ্চিত নিঃস্ব হয়ে থাকবে কেন?

মধুময়ের এক কাকা বাড়িতে এসে একদিন বললেন, শোন, তোর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি আমি। শুধু শুধু বাড়িতে বসে আছিস—

মধুময় অমনি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার চাকরির জন্য আত্মীয় স্বজনেরা সবাই যেন খুব চিন্তিত। এই জিনিসটাই তার ভালো লাগে না। সে কি সবার করুণার পাত্র? তার জন্য অন্যরা ব্যবস্থা করে দেবে কেন? তার নিজের কি যোগ্যতা নেই?

কাকা বললেন, আমাদের পাড়ার স্কুলের আমি কমিটি মেম্বার। তুই এ স্কুলে ঢুকে পড়।

মধুময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, স্কুলে?

হ্যাঁ, বেশী খাটুনি নেই। স্কুলে তো প্রায়ই ছুটি-ছাটা থাকে। তার ওপর গ্রীষ্মের ছুটি, পূজোর ছুটি—

স্কুলে পড়ানো আমার পোষাবে না।

কেন—পোষাবে না কেন? তোকে তো আর বরাবর স্কুল মাস্টারী করতে বলছি না। যত দিন তুই ভালো চাকরি না পাস···শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো·· তারপর মাস গেলে শ আড়াই টাকা, মন্দ কি।

আড়াইশো টাকা?

মনে কর ওটা তোর হাতখরচ।

আড়াইশো টাকার জন্য রোজ সকালে স্নান করে ভাত খেয়ে বেরুতে হবে—থাকতে হবে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত। অথচ আমারই মতন বি এসসি পাস করে যারা ব্যাঙ্কে বা এল আই সি-তে কিংবা কোন কমার্শিয়াল ফার্মে ঢোকে, তারা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করার জন্য অন্তত সাত আটশো টাকা পায়।

সে রকম চাকরি যত দিন না পাচ্ছিস · স্কুলে থাকতে থাকতেই অন্য জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে পারিস···আজকাল তো অনেক ভালো ছেলেই বসে না থেকে স্কুলের চাকরিতে ঢুকে পড়ে। তারপর নানা জায়গায় দরখাস্ত পাঠায়, কিংবা পরীক্ষা দেয়। দু-এক বছরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েও যায়।

মেজোকাকা, আমার স্কুলে পড়াবার যোগ্যতা নেই।

বি এসসি পাশ করেছিস, আর স্কুলের ছেলেদের তুই পড়াতে পারবি না?

সবাই কি পড়াতে পারে?

কেন পারবে না?

সেই জন্যই তো আজকাল ইস্কুলগুলোর এই অবস্থা।

মধুময়ের মাকে ডেকে মেজোকাকা বললেন, ও বৌদি, শুনুন আপনার ছেলের কথা। ওর জন্য অকটা স্কুলের কাজ জোগাড় করে আনলাম ও তাতে রাজি নয়। শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে আড়াইশো টাকা পেত।

মধুময়ের মা চট করে কোন মন্তব্য করলেন না। ছেলের মেজাজ তিনি জানেন। একবার কোন ব্যাপারে না বললে সহজে আর হাঁ করানো যায় না।

মেজোকাকা বললেন, স্কুলে তো আজকাল পড়াশুনো প্রায় হয়ই না। প্রায়ই স্ট্রাইক-ফাইক লেগেই থাকে। সেইজন্যই বলছিলাম, একবার ঢুকে পড়তে পারলে ঠায় বসে বসেই মাইনে পেতো।

মা আস্তে আস্তে বললেন, ও বোধ হয় স্কুলের কাজ পারবে না। একসঙ্গে অতগুলো ছেলেকে সামলানো···

মধুময় বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ মা। সবাই কি সব জিনিস পারে? আমার দ্বারা মাস্টারি করা হবে না।

বাড়িতে থাকলে মেজোকাকার সঙ্গে আরও তর্ক বিতর্ক করতে হবে বলে মধুময় একটা ছুতো দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ভেতরে ভেতরে রাগে সে ফুঁসছে।

কোন চাকরি পাচ্ছে না বলেই সে স্কুলে পড়াবে? স্কুলে পড়ানোটা এতই সহজ কাজ? অযোগ্যতা নিয়ে কিংবা অযত্নের সঙ্গে স্কুলের ছেলেদের পড়ানোটা অন্যায় নয়? অন্য চাকরির চেষ্টা করতে করতে স্কুলে দু-এক বছর কাটিয়ে মাইনে নেওয়ার চেয়ে একজন চোরা কারবারির টাকা ছিনিয়ে নেওয়া কি বেশী অন্যায়?

মঙ্গলবার রাত পৌনে এগারোটার সময় একটা ঘটনা ঘটল।

সন্ধ্যে থেকে একটা লোককে অনুসরণ করছিল মধুময় ও তার বন্ধুরা। লোকটা মেট্রো সিনেমা থেকে বেরিয়েছিল একটি মেয়ের

সঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে লোকটার চেহারায় বা ব্যবহারে কোন মিল নেই। লোকটার মুখখানা হিংস্র ধরণের, একটা দামী প্যান্ট ও সিল্কের হাওয়াই শার্ট পরা, হাতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি। মেয়েটি পরে আছে সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি, মুখখানা লাজুক লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে ঐ ধরনের পুরুষদের যোগাযোগ হয় একটিমাত্র উপায়েই। টাকার জোরে।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে লোকটি ঐ মেয়েটিকে নিয়ে ঢুকল একটি বারে। এখানে পর্দা ঘেরা কেবিন আছে। সেখানে ওরা বসে রইল দু' ঘণ্টা। মধুময়ের বন্ধু রতন আব ধনাও বারের মধ্যে গিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। মধুময় বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সেই বাব থেকে বেরিয়ে লোকটি আর মেয়েটি হাঁটতে লাগল। লোকটির চোখ লাল্‌চে হয়ে এসেছে, মুখের চামড়া চকচক করছে। মেয়েটি কিছু পান করেছে কিনা বোঝা যায় না।

চৌরঙ্গি তখন আলোকোজ্জ্বল। প্রচুর লোকজন, এখানে কিছু করার উপায় নেই। ওরা যদি হাঁটতে হাঁটতে জাদুঘরের দিকে যায়, তাহলেই মধুময়ের সুবিধে। ওদিকটায় অন্ধকার থাকে।

কিন্তু ওরা গ্র্যাণ্ড হোটেল পেরিয়ে এসেও আবার ফিরল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের গেটের কাছাকাছি এসে ওরা দাঁড়াল। লোকটি মেয়েটিকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, অথচ মেয়েটি যাবে না। এত বড় হোটেলে ঢুকতে মেয়েটি বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে। লোকটি একটুক্ষণ হাত পা নেড়ে মেয়েটিকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। মেয়েটি তবু যাবে না। তখন ওরা ঢুকল গ্র্যাণ্ড হোটেলের নীচেই আর একটা বারে। ওরা আরও খাবে। এবার বেরুলো সাড়ে দশটার সময়।

বেশী চেষ্টা করতে হল না, সহজেই পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। দরজা খুলে মেয়েটি আগে উঠল, লোকটি কিন্তু উঠল না। জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে বলতে লাগল কী যেন সব। তারপর হাতের ঝোলানো ব্যাগ খুলে কিছু টাকা তুলে দিল মেয়েটির হাতে।

ট্যাক্সি চলে যাবার পর লোকটা দু' হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। ওকে যে অন্য কেউ লক্ষ্য করছে, ও তা জানে না।

লোকটা রাস্তা পেরিয়ে চলে এলো গ্র্যাণ্ড হোটেলের উল্টো দিকে। যেখানে প্রাইভেট গাড়িগুলো পার্ক করা থাকে। লোকটা কি নিজের গাড়ি এখানে রেখে এতক্ষণ পায়ে হেঁটে ঘুরছিল? নিজের গাড়ি থাকতেও সে মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে করে পাঠিয়ে দিল? মানুষ কেন এমন করে কে জানে!

এদিকটায় বেশ অন্ধকার।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল মধুময়। খুব ব্যস্ত ভাবে দৌড়রার ভঙ্গি করে খুব জোরে ধাক্কা দিল লোকটাকে। কতটা জোরে ধাক্কা দিতে হবে তা মধুময়ের এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। লোকটা মাটিতে পড়ে যেতেই রতন আর ধনা এগিয়ে এসে নিপুণ হাতে ব্যাগটা তুলে নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

কিন্তু মধুময় চলে যাবার আগেই লোকটি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দু' হাতে চেপে ধরল মধুময়কে। লোকটার গায়ে বেশ জোর।

সে চেঁচিয়ে উঠল, শালা, তুম ধাক্কা মারা! কাহে মারা!

মধুময় নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারল না। কিন্তু একটুও দেরি করবার উপায় নেই। লোকটার চিৎকার শুনে এক্ষুনি লোক জড়ো হয়ে যাবে।

মধুময় প্রচণ্ড জোরে দুখানা ঘুঁষি মারল লোকটার থুতনিতে।

লোকটা 'মার ডালা. মার ডালা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ততক্ষণে কিছু লোক পৌঁছে গেছে সেখানে।

মধুময়ের বুক কাঁপছে, কিন্তু মুখখানা শান্ত। সে আদৌ পালাবার চেষ্টা করল না

লোকটা হাউ মাউ করে বলতে লাগল, হামারা ব্যাগ—বহুৎ রুপিয়া থা—ইতনা বড়া হ্যাণ্ড ব্যাগ!

মধুময় বিরক্তির সঙ্গে বলল, আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো? যত সব পেঁচি মাতাল?

অন্য লোকেরা এসে প্রশ্ন করতে লাগল, কী হয়েছে দাদা—কী হয়েছে ?

লোকটি বলল তার ব্যাগ হারাবার কথা।

মধুময় চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল, কত বড় ব্যাগ ?

লোকটা দু' হাত তুলে ব্যাগের মাপ দেখাল। লোকটার ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মধুময় হেসে অন্যদের বলল, দেখুন তো কী ঝামেলা। এ সব লোকদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত !

লোকটা মাতাল। কথা বলছে জড়িয়ে জড়িয়ে। সবাই মাতালের বিপক্ষে যায়। তা ছাড়া অত বড় একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ যে মধুময় নেয় নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। তা ছাড়া মধুময়কে কে সন্দেহ করবে ? তার সুন্দর চেহারা, মাথার চুল নিপাট ভাবে আঁচড়ানো, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব আছে।

কাছাকাছি কোথাও ব্যাগটা নেই। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই মাতালের প্রলাপ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। লোকটার জড়ানো কথার মধ্যে এটুকুই শুধু বোঝা গেল, এদিকে তার গাড়ি নেই, সে এদিকে এসেছিল হিসি করবার জন্য।

লোকটিকে ভিড়ের হাতে সঁপে দিয়ে মধুময় ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল।

এই তার প্রথম বাধা। যদি পুলিশ আসত, অবশ্য পুলিশ কিছুই প্রমাণ করতে পারত না। কলকাতা শহরে চলতে চলতে তো মানুষের সঙ্গে মানুষের ধাক্কা লাগেই। আর মধুময় নিজে কোন দিন ব্যাগ কেড়ে নেয় না।

পুলিশকে মধুময় ভয় পায় না। ভয়টা শুধু জানাজানি হয়ে যাওয়ার—যদি চেনাশুনো কোন লোক হঠাৎ দেখে ফেলে ? যদি ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ কোন দিন বেরিয়ে আসে স্বপ্নার দাদা ? যদি সেই সময়ই রতনরা ব্যাগটা নিয়ে পালাতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায় ?

কিন্তু এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ঝুঁকি না নিলে জীবনে কোন কাজই করা যায় না।

লোকটাকে ঘুঁষি মারার জন্য মধুময়ের একটুও অনুতাপ হয় নি। লোকটা যে একটা জাত শয়তান তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা নিরীহ মেয়েদের সর্বনাশ করে টাকার জোরে। এ সব টাকা ওরা পায় কোথায়? লোকটা ঐ মেয়েটিকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছিল। এক সন্ধ্যেতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে কত টাকা খরচ হয়? অনেক কেরাণীর এক মাসের মাইনের চেয়ে বেশী।

পর দিন সকালে দেখা করার কথা ছিল স্বপ্নার সঙ্গে। স্বপ্না ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্ড করাবে, মধুময় সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

পর দিন সকালে মধুময় অন্য মানুষ। সে স্বপ্নার প্রেমিক। রাসবিহারীর মোড়ে স্বপ্নার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে গুন গুন করে একটা গান গাইতে লাগল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কার্ড হয়ে গেল খুব সহজেই। বাইরে বেরিয়ে এসে স্বপ্না বলল, আজ এমন সুন্দর দিনটা, এক্ষুনি বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

ফিনফিনে হাওয়ার সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে। ওই বৃষ্টিতে ভিজতে বেশ ভালো লাগে। যেন বিদেশের তুষারপাতের মতন। গা ভেজে না। আকাশটা ছায়াময়, স্নিগ্ধ, সত্যিই একটা বেড়াবার মতন দিন।

স্বপ্না আবার বলল, এই সব দিনে কী ইচ্ছে করে জানো তো? ইচ্ছে করে কোন নদীর ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে। চল না, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি।

মধুময় বলল, গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখবে. ঠিক কোন না কোন চেনা লোক বেরিয়ে পড়বে।

স্বপ্না বলল, থাকুক গে চেনা লোক। তবু এমন দিনটা নষ্ট করতে চ্ছে করছে না।

গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে ভিখিরিরা এসে জ্বালাবে। তোমার ালো লাগবে না।

বুঝেছি, আসলে তুমি যেতে চাও না! তোমার আজ কোন টারভিউ আছে?

না, বরং তোমাকে আর একটা কোন নদীর ধারে নিয়ে যেতে ারি, যেখানে কোন চেনা লোক নেই, ভিখিরি নেই।

কোথায়?

চলই না—

কত দূরে?

সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব। বাড়িতে বরং একটা টেলিফোন রে দাও।

হাওড়া স্টেশনে এসে মধুময় একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটল টা। তার পকেটে যথেষ্ট টাকা, ইচ্ছে করলেই সে ফার্স্ট ক্লাসে াতে পারে, কিন্তু বেশী টাকা খরচ করতে দেখলেই স্বপ্না প্রশ্ন তুলবে। াইজন্যই, আগেকার থার্ড ক্লাস, আজকাল যার নাম হয়েছে সেকেণ্ড াস—সেই টিকিটই কাটল।

ট্রেনে উঠেই বুঝল, ভুল করেছে।

স্বপ্নার জন্য কোন ক্রমে একটা বসবার জায়গা পাওয়া গেলেও ুময়কে থাকতে হল দাঁড়িয়ে। অসম্ভব ভিড়। লোকেরা গায়ের পর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। স্বপ্নার পাশে সামান্য একটু জায়গা, ুময় নিজে সেখানে বসে নি, কিন্তু আর একটি লোক নির্লজ্জের তন সেখানেই বসে পড়ল ঠ্যাসাঠেসি করে।

মধুময়ের রাগে গা জ্বলতে লাগল। স্বপ্নাকে অন্য কেউ ছোঁয়, টা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু উপায়ও কিছু নেই।

ট্রেনে সবাই একটু জায়গার জন্য পাগল, সভ্যতা-ভব্যতা কেউ বড় একটা মানে না।

ভেবেছিল, জানালার ধারে বসে গল্প করতে করতে যাবে। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কথা বলাও যায় না।

স্বপ্না কিন্তু মজা পাচ্ছে। সকৌতুকে সে মাঝে মাঝে দেখছে মধুময়কে। মধুময়ের সঙ্গে এর আগে সে কখনো ট্রেনে চেপে কোথাও বেড়াতে যায় নি।

হঠাৎ খেয়াল হতেই মধুময় এক হাতে তার প্যান্টের পকেট চেপে ধরল। তার সব টাকা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। যদি কেউ পকেট মেরে নিয়ে যায়!

কথাটা ভেবেই অবশ্য হাসি পেয়ে গেল তার। এ টাকা তার নিজস্ব নয়। সে নিজেই কোন চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। এখন তার কাছ থেকেও যদি কেউ এ টাকা মারে, তবে সেই লোককে কী বলা যাবে?

* * *

ঘণ্টাখানেক পর ভিড় একটু ফাঁকা হতে মধুময় বসবার জায়গা পেল। স্বপ্না জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মধুময় বলল, আর আধঘণ্টা পরেই জানতে পারবে।

সেই আধঘণ্টা পরে ট্রেন ঝমঝমিয়ে পার হতে লাগল একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে। নীচে বিরাট একটা নদী। বর্ষার সময় দু'কূল ছাপিয়ে গেছে।

স্বপ্না জিজ্ঞেস করল, এই নদীর নাম কী?

রূপনারায়ণ।

স্বপ্নার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কত নাম শুনেছে এই নদীর। কত বইতে পড়েছে, কিন্তু আগে কখনো দেখে নি। কলকাতা থেকে এত কাছে? মাত্র দেড় ঘণ্টা?

উঠে দাঁড়িয়ে মধুময় বলল, আমরা এখানে নামব।

স্টেশনের নাম কোলাঘাট। নামটার সঙ্গে কেমন যেন একটা ইলিশ ইলিশ গন্ধ আছে। কোলাঘাট শুনলেই ইলিশ মাছের কথা মনে পড়ে যায়।

মধুময় জিজ্ঞেস করল, তোমরা তো একবার পুরী গিয়েছিলে—তখন এই নদী দেখ নি?

তখন এর ওপর দিয়ে গেছি?

হ্যাঁ, রাত্তিরে গিয়েছিলে বোধ হয়, তাই খেয়াল কর নি।

স্টেশনটা বেশ উঁচুতে। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওরা নেমে এলো নদীর ধারের রাস্তায়। সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা হাঁটবার পর একটা হোটেল পড়ল। প্রায় পৌনে দুটো বাজে। বেশ খিদে পেয়েছে।

মধুময় বলল, এসো, আগে খেয়ে নিই।

ভেতরে গিয়ে বসতেই একজন বেয়ারা এসে বলল, একটু আগেই নদী থেকে ধরা একদম টাটকা ইলিশ মাছ আছে বাবু!

মধুময় বলল, দাও। ভাত, ডাল আর মাছ ভাজা।

কলাপাতায় করে দেওয়া হল ভাত। হোটেলে তখন ওরা ছাড়া কেউ নেই। গরম গরম মাছ আর মাছের ডিম ভাজা আনতে লাগল। ওরা খেয়ে ফেলল পাঁচ-ছ'খানা করে।

স্বপ্না বলল, আমি জীবনে কখনো একসঙ্গে এত মাছ খাই নি। তবে সত্যি খুব চমৎকার স্বাদ।

খেয়ে উঠে ওরা চলে এলো নদীর ধারে। স্বপ্না বলল, আমরা একটু নৌকো করে ঘুরে বেড়াব না?

মধুময় বলল, বর্ষাকাল, যে কোন সময় ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।

তাতে কী হবে? উঠুক না ঝড়। আরও ভালো লাগবে।

যদি নৌকো উল্টে যায়?

যাক না। আমি ডুবে যাব? কেন তুমি আমায় বাঁচাতে পারবে না?

তা পারব অবশ্য।

স্বপ্না ঠোঁট উল্টে বলল, ইস, তার দরকার হবে না মোটেই আমি খুব ভালো সাঁতার জানি।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নৌকা পাওয়া গেল না। সব নৌকা চলে গেছে মাছ ধরতে।

তাকালেই দেখা যায়, নদীর বুকে এখানে ওখানে মোচার খোলার মতন দুলছে মাছ ধরা নৌকা। সবাই জাল ফেলে বসে আছে। মাঝে মাঝে জাল টেনে তুলছে, তখন দেখা যাচ্ছে চকচকে ইলিশের মৃত্যুর আগের শেষ দুটি তিনটি লাফ।

মধুময় জিজ্ঞেস করল, এর আগে তুমি কখনও ইলিশ মাছ লাফাতে দেখেছ?

সত্যি, আগে কখনো দেখি নি।

হঠাৎ বেশ জোরে বৃষ্টি এসে গেল। তাতে অবশ্য ভেজার ভয় নেই। ওরা দৌড়ে এসে দাঁড়াল একটা ব্রীজের নীচে। এখানে পাশাপাশি তিনটে ব্রীজ, দুটো ট্রেনের জন্য। একটা মানুষ ও গাড়ির

ব্রীজের নীচে একেবারে নদীর ধারে দুখানা সিমেন্টের চাঙ্গাড়ের ওপর বসল ওরা। নদীর বুকে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। অদ্ভুত মোহময় সেই দৃশ্য।

মধুময় তার একটা হাত রাখল স্বপ্নার কাঁধে।

স্বপ্না মধুময়ের দিকে তাকাল।

মধুময় অনুনয় করে বলল, আজ আপত্তি কোরো না, প্লীজ। খুব ইচ্ছে করছে, তোমাকে একটু ছুঁয়ে থাকি।

স্বপ্না সরিয়ে দিল না হাতটা। বরঞ্চ মধুময়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুময় বলল, এই নদী দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ মিথ্যা নয়।

স্বপ্না হেসে বলল, হল না।

স্বপ্না সাহিত্যের ছাত্রী ছিল। মধুময়ের চেয়ে এ সব সে অনেক ভালো জানে।

সে বলল, "রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।"

মধুময় বলল, ঐ একই হল। মিথ্যা আর স্বপ্ন তো একই।

স্বপ্না বলল, এক? মিথ্যা আর স্বপ্ন এক?

স্বপ্নটাও মিথ্যে নয়?

না। মোটেই না। মিথ্যেটা শুধুই মিথ্যে। আর স্বপ্নটা সত্যিও না, মিথ্যেও না, অন্য রকম কিছু।

মধুময় বলল, হ্যাঁ, ঠিকই তো। তোমার নাম স্বপ্না, তুমি মিথ্যেও নও, সত্যিও নয়, তুমি সব কিছুর থেকে আলাদা!

স্বপ্না হাসল।

মধুময় হঠাৎ একটা কিছু দেখে দারুণ চমকে উঠল। তার জামাটার নীচের দিকে একটা লাল রঙের ফোঁটার দাগ। জামাটার রং হলদে বলে ভালো করে নজর না দিলে দেখা যায় না।

এটা কিসের দাগ? নিজের মনকে প্রশ্ন করবার আগেই মধুময় অবশ্য উত্তরটা জানে। এটা রক্তের দাগ। কালকের জামাটাই পরে এসেছে মধুময়। কাল রাত্তিরে লোকটাকে ঘুষি মারবার ফলে লোকটার ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই রক্তেরই একটু ছিটে লেগেছে মধুময়ের জামায়।

মধুময়ের গা-টা ঘিন ঘিন করে উঠল। একটা নোংরা লোকের রক্ত লেগে আছে তার জামায়। লোকটার নিষ্ঠুর লোভী মুখখানা ভেসে উঠল তার চোখে।

সে স্বপ্নার কাঁধ থেকে উঠিয়ে নিল নিজের হাত। এই রকম নোংরা জামা পরে স্বপ্নাকে ছুঁয়ে থাকা উচিত নয়।

তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে! স্বপ্না বলল।

কই, না তো! এমনি বৃষ্টি দেখছি।

ঐ ছাখ, ব্রীজের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন আসছে।

একটু দূরে একটা ইটের নৌকা দাঁড় করানো। দুজন লোক মাথায় করে ইট নিয়ে আসছে পারে। নৌকাটা চওড়া করে রাখতে

হয়েছে বলে, ওদের খানিকটা জলের মধ্যে নেমে গিয়ে আনতে হচ্ছে ইট। লোক দুটোরই বুকের পাঁজরা বার করা। পুরো নৌকার ইট নামাতে ওদের নিশ্চয়ই সারা দিন লেগে যাবে। সারাদিন এত পরিশ্রম করে ওরা ক' টাকা পায়? নিশ্চয়ই ভালো করে খেতে পায় না, নইলে অত রোগা হবে কেন? সারাদিন এত পরিশ্রম করেও মানুষ খেতে পায় না!

লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মধুময় বুঝতে পারল জোয়ার এসে গেছে, ক্রমশঃ নদীর জল বাড়ছে। কেননা একটু আগে ওরা হাঁটু জল পর্যন্ত নামছিল, এখন ওদের উরু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে।

এ সব নদীতে বান ডাকে না, তাই ভয় নেই। জোয়ারের সময় জল বাড়ে আস্তে আস্তে। বেলাভূমির ওপর জল কতটা এগিয়ে আসছে চট করে বোঝা যায় না।

মধুময়ের ইচ্ছে হল, সে এই নদীতে নেমে যায়। ডুব দিয়ে খুব ভালো করে স্নান করে। জামাটা ধুয়ে মুছে ফেলে রক্তের দাগটা। কিন্তু তাতে কাল রাত্তিরের স্মৃতি কি মুছে যাবে?

বারবার মনে পড়ছে সেই লম্পট লোকটার মুখ। খেলাটা ভেঙে যাচ্ছে। মধুময় এ রকম চায় নি। স্বপ্নার কাছে যখন আসবে, তখন সে অন্য মানুষ থাকতে চায়।

তার গোপন জীবনের কোন ছাপ যেন না পড়ে।

কিন্তু জামায় এই রক্তের ছিটে!

মধুময় উঠে গিয়ে এক টুকরো ইট দিয়ে বালির ওপর একটা জাহাজ আঁকতে লাগল। প্রায় স্বপ্নার পায়ের কাছে। আঁকার হাত ছিল মধুময়ের, সে শিল্পী হতে হতে হল না, তার বদলে ছিনতাই দলের সদস্য হয়েছে।

স্বপ্না বলল, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে তো জাহাজটা!

মধুময় বলল, এক্ষুনি আমরা একটা জাহাজ ডুবি দেখব।

স্বপ্না বলল, তার মানে?

বুঝতে পারলে না—জল বাড়তে বাড়তে এই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবে।

জল বাড়ছে নাকি?

তাকিয়ে থাকো, এবার বুঝতে পারবে।

এবার সত্যিই জল বাড়ার ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু একটু করে এগিয়ে এসে নদীর রেখা প্রথমে ছুঁয়ে দিল জাহাজটার একটা প্রান্ত। তারপর এগোতে লাগল একটু একটু করে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ডুবে গেল জাহাজটা। স্বচ্ছ টলটলে জলের নীচে বালির ওপর মধুময়ের আঁকা জাহাজটা পরিষ্কার দেখা যায়।

জল বেড়ে এসে ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল স্বপ্নার পায়ের কাছে। একটুক্ষণের মধ্যেই তার গোড়ালি পর্যন্ত এসে গেল।

স্বপ্না বলল, কী দারুণ ব্যাপার, না? নদীটা কত দূরে ছিল, আর কত কাছে এসে গেল—এ রকম আগে কখনো দেখি নি।

আর এখানে বসা যায় না। জল আরও বাড়বে। এবার স্বপ্নার শাড়ি-টাড়ি ভিজে যাবে। দুপুর ঢলে এসেছে। এবার বাড়ি ফেরার কথাও মনে আসে।

উঠে স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্না বলল, তুমি আমাকে নদী দেখাবে বলেছিলে, দেখালে না তো!

মধুময় অবাক হয়ে স্বপ্নার দিকে তাকাল।

স্বপ্না বলল, এটা তো নদী নয়, নদ। রূপনারায়ণ নদ। বলেই স্বপ্না ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল খিলখিল করে।

মধুময় বলল, ও পুরুষ, তাই বল। সেই জন্যই তোমার পা জড়িয়ে ধরবার জন্য এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল।

স্টেশনে এসে মধুময় আর ভুল করল না। আর সে ভিড়ের কামরায় যেতে পারবে না। স্বপ্নার সঙ্গে এই প্রথম ট্রেনে বেড়ানো। সে টিকিট কাটল ফার্স্ট ক্লাসের।

যথারীতি স্বপ্না অবাক।

তুমি এত টাকা খরচ করলে শুধু শুধু?

একটা আংটি বিক্রি করে দিলাম যে। সেই টাকা রয়েছে।

আবার আংটি বিক্রি করেছ? কেন? তোমার দরকার হলে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারো না?

আংটি তো আমি পরিই না বলতে গেলে। আর কখনো পরবও না। শুধু শুধু রেখে লাভ কী?

তবু জিনিসপত্র বিক্রি করা আমি পছন্দ করি না।

শোন স্বপ্না, এমন সুন্দর দিনগুলি আমরা টাকার অভাবে নষ্ট করব? অন্য লোকরা আনন্দ করবে, আর আমরা করব না?

মধুময় আড়চোখে আর একবার তার জামার রক্তের ফোঁটাটার দিকে তাকালো। স্বপ্না দেখতে পায় নি। হলদে জামা, হয়তো স্বপ্না লক্ষ্যও করবে না।

মধুময় মনে মনে তীব্র ভাবে বলল, না, আমি কোন অন্যায় করি নি। একটা বদমাস লোক রাস্তা থেকে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে মদের দোকানে কিংবা হোটেলে এক রাত্রে তিন-চারশো টাকা ওড়ায়। আর এক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা ট্রেনে নিরিবিলিতে একটু ভ্রমণ করতে পারবে না? কোন্‌টাতে টাকার সবচেয়ে ভালো ব্যবহার হয়?

ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা একদম ফাঁকা। লোকাল ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে সাধারণত জায়গা পাওয়া যায় না। কলেজের ছাত্র, ভিখিরি আর হকাররা এসে খুব গোলমাল করে। কিন্তু এখন এই শেষ বিকেলে তারা কেউ নেই।

চলন্ত ট্রেনের নির্জন কামরায় যেন একটা রোমান্টিকতার গন্ধ মাখানো। মুখোমুখি বসে থাকা। বাইরে চলমান সবুজ মাঠ। সব কিছু বড় মোহময়।

হঠাৎ ঝুঁকে মধুময় তার দু'হাত রাখল স্বপ্নার কাঁধে। ভিখিরির মতন করুণ গলায় বলল, তোমায় একটু আদর করব?

স্বপ্না মধুময়ের হাত দুটো ধরে বলল, তুমি আর আমি এ রকম একটা আলাদা জায়গায় বসে আছি—এই তো আমার দারুণ ভালো লাগছে।

তোমায় একবার চুমু খাই ?

না, প্লীজ।

একবার। কেউ দেখবে না এখানে।

না। যখন সময় আসবে।

মধুময় এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্বপ্নার দিকে। তার বন্ধুরা সবাই বলে, মেয়েরা মুখে কখনো 'হ্যাঁ' বলে না। ইচ্ছে থাকলেও মুখে 'না না' বলে। একটু জোর করতে হয়। মেয়েরা ঐ জোর করাটাই পছন্দ করে।

মধুময় কি স্বপ্নার ওপর জোর করবে ? মধুময় নিজের হাত দুটো স্বপ্নার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল। জামায় ঐ রক্তের ছিটেটুকু না থাকলে সে নিশ্চয়ই আজ স্বপ্নাকে জোর করে বুকে টেনে নিত। কোন আপত্তিই শুনত না।

তুমি রাগ করলে ?

না, রাগ করি নি।

প্লীজ, রাগ করে আজকের এই সুন্দর দিনটা নষ্ট করে দিও না। আমার এত ভালো লাগছে আজ সব কিছু।

সত্যিই রাগ করি নি। কিন্তু তুমি যে বললে, যখন সময় আসবে ...যদি কোন দিনই আর সময় না আসে ?

যাঃ, তাই কখনো হয় ? আমরা একসঙ্গে থাকব না ?

আমি চাকরি না পেলে তোমায় বিয়ে করতে পারব না। যদি কোন দিনই চাকরি না পাই ?

নিশ্চয়ই পাবে।

তিন বছর তো হয়ে গেল...অনেকে শুনেছি আট দশ বছর বেকার, যদি আমারও সেই অবস্থা হয় ?

আমি ততদিনই অপেক্ষা করে থাকব। এমন কি যদি প্রয়োজন হয় তবে চিরকাল...

চিরকালের কথা বোলো না। শুনলেই আমার ভয় করে। চিরকাল কি কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করতে পারে ?

তুমি চাকরি না পেলেই বা. আমি তো চাকরি পেতে পারি একবার তো একটা পেয়েও ছিলাম, নিই নি। আবার যদি চেষ্টা করি, আমি ভালো একটা চাকরি পেলেই তারপর আমরা···

এ কথা সত্যি; যে স্বপ্না চেষ্টা করলেই একটা চাকরি পেতে পারে। স্বপ্নার রেজাল্ট ভালো। তা ছাড়া মেয়ে বলেই কি না কে জানে, সে দরখাস্ত পাঠালেই ইন্টারভিউ-এর ডাক আসে। আর মধুময়ের অধিকাংশ দরখাস্তের কোন উত্তরই আসে না।

মধুময় বলল, তুমি চাকরি করতে যাবে, আর আমি বাড়িতে বসে থাকব ?

বসে থাকবে কেন—তুমি বাড়িতে বসে ছবি আঁকবে। সেটাই তোমার কাজ।

আমার ছবি আঁকা তো শখের কাজ। আমি তো শিল্পী নই। তারপর যদি আমাদের ছেলে মেয়ে হয়, তুমি অফিসে যাবে, আর আমি ঘরে থেকে বাচ্চাকে খাওয়াব, ঘুম পাড়াব, স্কুলে দিয়ে আসব—

যাঃ! ও রকম ভাবে বোলো না।

মধুময় তিক্তভাবে হা-হা করে হেসে উঠল।

শিয়ালদা স্টেশনে পরের কাজটা হল খুব নিখুঁত ভাবে। দারুণ ভিড় সেদিন। পর পর কয়েকটা ট্রেন বাতিল হবার ফলে সাজ্ঘাতিক হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল। এই সব দিন মধুময়দের কাজের পক্ষে খুব চমৎকার।

একটা ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে একদল যাত্রী হুড়হুড়িয়ে নেমে আসছে, আর একদল তক্ষুনি সেই ট্রেনে ওঠবার জন্য ঠ্যালাঠেলি শুরু

করেছে—সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মধুময় একজন বুড়ো লোককে এমন সুকৌশলে ল্যাং মারল যে সেই বুড়ো বুঝতেই পারল না, কে তাকে মেরেছে।

বুড়োটি পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে, মাটিতে মাথা ঠুকে অজ্ঞানের মতন হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। রতন আর ধনা চোখের নিমেষে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সরে পড়ল। পরিষ্কার কাজ।

বুড়োটি চোখ মেলে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল।

আমার ব্যাগ? আমার ব্যাগ কে নিল? ওর মধ্যে যে আমার যথাসর্বস্ব ছিল গো!

এ রকম অনেকেই বলে, মধুময় বিশেষ মনোযোগ দিল না। বিশেষত বুড়ো লোকেরা কান্নাকাটি করে নাটক সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। বুড়োটির মুখখানা ঠিক একটা শকুনির মতন। নিশ্চয়ই এক নম্বরের ধড়িবাজ!

আমার মেয়ের বিয়ের টাকা···আমার শেষ সম্বল···

সবাই মহা ব্যস্ত, তবু বুড়োটির কান্নাকাটি শুনে একটা ভিড় জমে গেল। মধুময় একপাশে সরে দাঁড়াল। কেউ তাকে ল্যাং মারতে দেখে নি।

বুড়োটি উঠে বসে দারুণ ভাবে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, আমি এখন বাড়ি ফিরব কী করে? ওরা আমাকে মেরে ফেলে গেল না কেন? আমার মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে···প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে আজই সাড়ে তিন হাজার টাকা তুলে আনলাম···সামান্য স্কুল মাস্টারি করি···

মধুময় ভুরু কোঁচকাল। এই বুড়োটি তাহলে স্কুল মাস্টার! দেখে কিন্তু মনে হয়েছিল, লোকটি এক নম্বরের ঘুঘু। মানুষ ঠকানোই এর পেশা।

লোকটি এমন ডুকরে কাঁদতে লাগল যে সহানুভূতি না জেগে উপায় নেই।

একজন বলল, ও দাদু, পুলিশে খবর দিন।

আর একজন বলল, পুলিশে খবর দিলে ঘোড়ার ডিম হবে। এ রকম তো হামেশাই হচ্ছে।

মধুময় ভাবতে লাগল, সত্যিই কি এই বুড়ো লোকটির মেয়ের বিয়ের টাকা? অনেকে সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য এ রকম মিথ্যে কথা বলে।

কয়েকজন লোক ধরাধরি করে বুড়োটিকে নিয়ে গেল রেলওয়ে পুলিশের কাছে। মধুময়ও কৌতূহলী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

লোকটি সত্যিই নিজেকে স্কুল মাস্টার বলে পরিচয় দিল। রিটায়ারমেন্টের আর মাত্র এক বছর বাকি। মেয়ের বিয়ে আর পাঁচদিন বাদে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে আজই টাকা তুলে এনেছিল। মোট সাড়ে তিন হাজার টাকা।

দুজন যাত্রী সাক্ষী দিল, তারা লোকটিকে চেনে। উনি থাকেন বেলঘরিয়ায়। পড়ান শ্যামবাজারের এক স্কুলে। অতি নিরীহ মাটির মানুষ। পাড়ার সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ওঁর মেয়ের জন্য সবাইকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করা হয়ে গেছে।

মধুময় এদিক ওদিক তাকাল। অবশ্য কোন লাভ নেই। রতন আর ধনা ব্যাগটা নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায় বিয়ে হয়? সাড়ে তিন হাজার টাকার জন্য বিয়ে আটকে যাবে?

আজ আর মধুময়ের ট্রেন ধরে দূরে যাবার দরকার নেই। কেউ তাকে দেখে নি। সে এখন স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে। তবু সে ট্রেনে উঠে পড়ল। সেই বুড়ো লোকটার সঙ্গে একই কামরায়।

বুড়ো লোকটি ট্রেনে বসেও কাঁদতে লাগল অনবরত। আর তাকে সান্ত্বনা দেবার বদলে অন্য লোকেরা শোনাতে লাগল আরও নানা রকম চুরি ও রাহাজানির গল্প।

মধুময় একদৃষ্টে চেয়ে রইল বুড়ো লোকটির মুখের দিকে। মুখ দেখে সব সময় মানুষ চেনা যায় না। এই লোকটি যদি অতি বদমায়েসই হবে তাহলে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ইস্কুলে মাস্টারী করে গেল

কেন? মানুষ ঠকানোর তো আরও অনেক ভালো ভালো উপায় আছে। এর আগে যাদের কাছ থেকে ব্যাগ কাড়া হয়েছে, তারাও সবাই কি বদমাস ছিল তাহলে?

*　　*　　*

বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে আবার আর একটা কাণ্ড হল। বুড়ো লোকটি হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। কিছুতেই বাড়ি যাবে না। বাড়িতে গিয়ে কী করে সে মুখ দেখাবে।

একদল যুবক উৎসাহী হয়ে বলে উঠল, চলুন দাদু, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। কী আর করবেন বলুন। আপনাকে যে প্রাণে মারে নি এই ঢের। ওরা অনেক সময় ছোরাছুরি চালায়।

মারল না কেন! ওরা আমাকে মেরে ফেললেই আমি বাঁচতাম! মেয়েটার বিয়ে হবে না, সর্বনাশ হবে।

মধুময়ও ভিড়ে গেল সেই যুবকদের দলে। একটা রিক্‌শায় বুড়ো মানুষটাকে চাপিয়ে ওরা চলল পিছন পিছন।

বাড়ি খুব বেশী দূর নয়। স্টেশন থেকে সাত আট মিনিটের পথ। বাড়ি মানে খুবই সামান্য ব্যাপার। দু'খানা ঘর, পাকা দেয়াল হলেও ওপরে টিনের চাল। সামনের জমিতে ঢ্যাঁড়স আর বেগুন ফলে আছে।

বাড়ির সামনে বৃদ্ধটি আর একপ্রস্থ কান্না শুরু করতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে। তাদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে মধুময়ের যেন হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। একুশ বাইশ বছরের একটি মেয়ে, সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরা, লাজুক ধরনের মুখখানা। খুব সম্ভবত এই মেয়েটিরই বিয়ে—

কিন্তু এই মেয়েটিকেই মধুময় সেদিন চৌরঙ্গিতে দেখেছিল না? সেই লম্পট লোকটির সঙ্গে? মধুময়ের খুব ভালো মনে নেই, কিন্তু এর সঙ্গে খুবই মিল, সেই একই রকম মুখের লাজুক ভাব। যদি এই

মেয়েটি না-ও হয়, তবু ঠিক এরই মতন একটি মেয়ে, ভদ্র পরিবারের, কিন্তু টাকার অভাবে ওই সব জায়গায় গিয়ে লম্পট ধনীদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়।

আর যদি সত্যিই এই মেয়েটি হয়? গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঢুকতে রাজি হচ্ছিল না কিছুতেই। হয়তো মেয়েটি পুরোপুরি পাপের জীবনে যেতে চায় নি। বিয়ে করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিল।

সাড়ে তিন হাজার টাকার জন্য মেয়েটির বিয়ে হবে না। মেয়েটি আবার বাধ্য হয়ে ঐসব লম্পটদের কাছে যাবে।··মধুময়ের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে—ন্যায় অন্যায় বোধ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে একটি পরিবারের সর্বনাশের জন্য সে নিজে দায়ী।

তার পকেটে আজ মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আছে। অবশ্য হুট করে এদের টাকা দিতে গেলেই বা এরা কী ভাববে।

উল্টো দিকের ট্রেন ধরে মধুময় ফিরে এলো শিয়ালদায়। সেখানে আবার মানুষ জন যেমন দৌড়চ্ছিল তেমনিই দৌড়চ্ছে। খানিক আগে যে একজন বৃদ্ধ লোক এখানে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তার কোন চিহ্নই নেই। একটা বেঞ্চে চারজন পুলিশ বসে নিশ্চিন্ত ভাবে সিগারেট টানছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় রতন, ধনারা নেই। মধুময়ের আজ অনেক দেরি হয়েছে। ওরা থাকবেই বা কেন?

পর দিন মধুময় পাগলের মতন খুঁজতে লাগল রতনদের। কোথাও ওদের পাত্তা নেই। সন্ধ্যের দিকে ওদের পাড়ার ফ্যাক্টরির পিছনের জমিতে ওদের আড্ডা বসে, সেদিন ওখানেও কেউ আসে নি। রতনের বাড়িতে তিনবার গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না।

সারারাত ঘুমোতে পারল না মধুময়। পর দিন ভোরবেলা রতনের বাড়িতে গিয়ে তাকে ধরল।

ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে রতন চমকে উঠল মধুময়কে দেখে। চোখ দুটো লাল্‌চে, উস্কো-খুস্কো চুল মধুময়ের। এ রকম চেহারায় তাকে দেখা যায় না কখনো।

রতন ফিসফিস করে বলল, কী হল! তুই ধরা পড়েছিলি? তোকে মেরেছে?

মধুময় গম্ভীর গলায় বলল, না।

সেদিন তুই এলি না দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মাইরি! ভাবলাম, নির্ঘাৎ তুই ধরা পড়েছিস।

তবু তোরা আমাকে দেখতে যাস নি।

কোন লাভ আছে? সবাই মিলে ধরা দিয়ে লাভ কি বল?

আমার সঙ্গে একটু আয় রতন, জরুরি কথা আছে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে বসল একটা পার্কে। মধুময়ের ব্যবহার দেখে রতন একটু ঘাবড়ে গেছে। সে পুরোনো পাপী, তাই পুলিশে ধরা পড়ার ভয় তার বেশী। সে মনে মনে ঠিক করেছিল, কয়েক দিনের জন্য বাড়ি থেকে গা ঢাকা দেবে। তার অন্য আস্তানা আছে।

মধুময় সরাসরি বলল, পরশু আমরা যে টাকাটা পেয়েছি সেটা ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে—

রতন আকাশ থেকে পড়ল। টাকা ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে? ছিনতাইয়ের টাকা কেউ ফেরৎ দেয়? ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

মধুময় বলল, আমরা বেছে বেছে বদমাস লোকদের টাকা কাড়ব ঠিক করেছিলাম। অন্তত আমি সেই জন্য এসেছিলাম তোদের দলে। যাতে আমার বিবেক পরিষ্কার থাকে। কিন্তু পরশু আমাদের ভুল হয়েছে। লোকটা একজন নিরীহ স্কুল মাস্টার। ওটা ওর মেয়ের বিয়ের টাকা।

এ সব ভাবালুতায় রতনের মন গলে না। সে বলল, হ্যাট্! কী সব আগডুম বাগডুম বকছিস! টাকা ফেরৎ দিতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবি!

মধুময় বলল, না, ধরা পড়ব না। আমি লোকটার বাড়ি দেখে এসেছি। লোকটার নাম জেনেছি। বাড়ির নম্বর আর রাস্তার নামও জেনে এসেছি। টাকাটা ওকে মানিঅর্ডার করে পাঠালে এখনো ওর মেয়ের বিয়ে হতে পারে।

পোস্ট অফিস থেকে টাকা পাঠাবি? পুলিশ ঠিক খোঁজ করে বার করে ফেলবে তোকে।

সে ঝুঁকি আমি একলা নিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি জানি, পুলিশ আমার খোঁজ পাবে না।

যাব্ বাবা! এ সব কী আজব কথা! কিন্তু টাকাটা তো আমার কাছে নেই।

তার মানে?

তুই সেদিন এলি না বলে ভাগ বাঁটোয়ারা হল না। পুরো টাকাটা আমি ধনার কাছে রেখেছি।

ঠিক বলছিস? যদি মিথ্যে কথা বলিস রতন, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি এ লাইন আজ থেকে ছেড়ে দিচ্ছি · কিন্তু এ টাকাটা ফেরৎ না দিলে আমি তোদের সবক'টাকে ধরিয়ে দেব।

শোন মধুময়, মিথ্যে নিয়েই আমাদের কারবার। পথে ঘাটে হাজার রকম মিথ্যে বলি। সেইজন্যই দলের লোকদের কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলি না একটাও। ওতে দল টেঁকে না।

তবু মধুময় পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করল, ব্যাগে কত টাকা ছিল।

সাড়ে তিন হাজার।

ঠিক আছে, আমি ধনার কাছে এক্ষুনি যাচ্ছি। তুইও চল আমার সঙ্গে।

আমি যাব না ভাই। তুই যে রকম কথাবার্তা বলছিস, তাতে আমার ভয় লেগে যাচ্ছে। একসঙ্গে তিনজন এখন না জোটাই ভালো। তুই ধনার কাছ থেকে সব টাকাটা নিতে চাস নে, আমি আপত্তি করব না। তারপর সেই টাকা নিয়ে তুই যা-খুশি কর। কিন্তু লোক জানাজানি করিস না।

আর একটু দেরি করলে ধনাকে বাড়িতে পাওয়া যেত না। সে জামা কাপড় পরে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

মধুময়কে দেখে সেও বলল, তুই ধরা পড়িস নি তাহলে!

মধুময় বলল, কেন, আমি ধরা পড়লে তোরা খুশি হতিস?

ধনা অবাক হয়ে বলল, যাঃ, কী বলছিস! তুই ধরা পড়লে আমরা খুশি হব কেন? তুই আমাদের নাম বলে দিলে তো আমরাও ফেঁসে যেতাম।

হয়তো ভেবেছিলি, আমাকে আর ভাগ দিতে হবে না।

তোর বখরা নিতে এসেছিস বুঝি? কিন্তু তোকে ক'দ্দিন সবুর করতে হবে ভাই।

কেন?

আমি টাকাটা সব খরচ করে ফেলেছি।

মধুময় সঙ্গে সঙ্গে ধনার গলা চেপে ধরে বলল, তোকে আমি খুন করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস?

মধুময়ের তুলনায় ধনার গায়ের জোর অনেক কম। সে মধুময়ের সঙ্গে কিছুতেই পারবে না। অসহায় ভাবে মধুময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমাকে মেরে ফেলতে চাস,

মেরে ফেলিস। কিন্তু আজ নয়, আজ ছেড়ে দে। আজ আমার ভীষণ দরকার, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

তার চেয়েও অনেক বেশী দরকারী কাজে আমি এসেছি—পরশুর পুরো টাকাটা আমার চাই। রতনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি, সে রাজি হয়েছে।

বললাম তো খরচ হয়ে গেছে। তোর ভাগটা আমি পরে শোধ করে দেব।

তোকে আমি শেষ করে দেব, ধনা!

আমার কথাটা আগে শোন। আমার গলাটা ছাড়। আমার মা নার্সিং হোমে, আমাকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে। আমার মা কাল মরতে বসেছিলেন। কাল হঠাৎ মায়ের অ্যাপেনডিক্স বার্স্ট করেছে। তক্ষুনি অপারেশন না করালে বাঁচাবার কোন আশাই ছিল না। কোন হাসপাতালে জায়গা পাই নি, তাই নার্সিং হোমে ভর্তি করালাম। তিনজন বড় ডাক্তারের ফি, চোদ্দ বোতল রক্ত কিনতে হয়েছে বাইরে থেকে, ডবল দাম দিয়ে···

আমি তোর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

তুই চল আমার সঙ্গে নার্সিং হোমে···আমি কোন দিন বন্ধু-বান্ধবকে বিট্রে করি না···কাছে যদি টাকাটা না থাকত, তাহলে কিছু করার উপায় ছিল না। কিন্তু টাকা রয়েছে আমার কাছে, অথচ আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন, এটা আমি সহ্য করতে পারি? তুই বল? আমার তিনটে ছোট ভাই বোন আছে। মা মারা গেলে ওদের নিয়ে আমি একেবারে পথে বসতাম!

মধুময়ের তুলনায় ধনার বাড়ির অবস্থা অনেক খারাপ। মধুময়ের তবু বাবা বেঁচে আছেন এবং চাকরি করেন, ধনার বাবা মারা গেছেন অনেক দিন।

মধুময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু টাকাটা খরচ হয়ে গেল! জানিস, একটা মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল এজন্য, হয়তো তার ভবিষ্যতটাই—

কার বিয়ে ?

মধুময় ঘটনাটা খুলে বলল। ধনারও মনের ভাব হল রতনের মতনই। সে ভাবল, মধুময় বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছে।

সে মধুময়ের হাত চেপে ধরে অভিযোগের সুরে বলল, তুই এই কথা বলছিস্ ? একটা মেয়ের বিয়ে আটকে যাওয়া কি আমার মায়ের মৃত্যুর চেয়ে বড় কথা ? আমার মা মরলে তুই খুশি হতিস ?

আঃ! বাজে বকিস না। এ রকম কোন তুলনা চলে না।

তুই কাল এলে আমি টাকাটা দিয়ে দিতে পারতাম। তারপর আমার মা মরলে মরতেন !

আমি সে কথা বলি নি।

মেয়েটির পরে আবার বিয়ে হতে পারে।

কী করে হবে ? ওর বাবার শেষ সম্বল ঐ সাড়ে তিন হাজার টাকা।

আমরা আর চার পাঁচটা কেস করে কিছু টাকা তুলে ওদের পাঠিয়ে দিতে পারি।

আমি এ লাইনে আর নেই। আর কোন দিন যাব না আমি তোদের সঙ্গে।

দু'দিন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে থাক। আমি নার্সিং হোমে যাচ্ছি রে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হবার কথা। ভালো করে স্নান-টান সেরে কাচা জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল মধুময়। মুখখানা তার শুকনো বিষণ্ণ। সে নিজেই বুঝতে পারছে।

স্বপ্নার সামনে এসে সে হাসি ফোটাল জোর করে। প্রথমে দেখল একটা সিনেমা। তারপর বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে খাবে।

স্বপ্না বলল, আজ আমি খাওয়াব কিন্তু, তুমি পয়সা খরচ করতে পারবে না।

মধুময় একটুও আপত্তি করল না।

ওরা বসল একটা কেবিনে। এখানেও ওরা মুখোমুখি দুজন। কিন্তু ট্রেনের কামরার সঙ্গে কত তফাৎ। একটু পর্দা সরে গেলেই বাইরে থেকে একগাদা লোভী চোখ উঁকি মারে।

স্বপ্না যাতে কিছুতেই বুঝতে না পারে, সেই জন্য মধুময় মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে নানা রকম আবোল তাবোল কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু তার দুটো জীবন আর আলাদা নেই।

আজ আর মধুময়ের জামায় রক্তের ছিটে নেই, তবু তার সর্বাঙ্গ অশুচি মনে হচ্ছে। সে স্বপ্নার হাতটাও ধরল না। বারবার মনে পড়ছে বেলঘরিয়ার সেই ছোট্ট বাড়িটার মেয়েটির কথা। সে কত আশা করেছিল কয়েক দিন বাদে তার বিয়ে হবে।···আর হবে না। মেয়েটি আবার চৌরঙ্গিতে এসে দাঁড়াবে, সংসার চালাবার দায়ে লোভী ধনীদের শিকারের জন্য। মধুময়ই এজন্য দায়ী। মধুময়ই দায়ী? মেয়েটির বিয়ে হওয়া বড়, না ধনার মায়ের চিকিৎসা? কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়?

ঐ মেয়েটি আর তার বাবাকে সাহায্য করার জন্য মধুময় কি আবার ছিনতাই-এর কাজে নামবে? ওদের সাহায্য করার জন্য অন্য লোকদের টাকা কেড়ে নেওয়া কি ঠিক? আবার যদি তাদের মধ্যে কেউ ঐ বুড়ো লোকটির মতন···

মধুময় ডাকল, স্বপ্না?

স্বপ্না বলল, কী?

মধুময় বুঝতে পারল, এই প্রশ্ন স্বপ্নার কানে তুলে কোন লাভ নেই। স্বপ্না কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই সে হাসি মুখে বলল, না, কিছু না।

তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়েই কেঁপে উঠল। কিছুতেই সামলাতে পারল না নিজেকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপেও আটকাতে পারল না।

মধুময় নিঃশব্দে কেঁদে উঠল। চোখ দিয়ে পড়তে লাগল বড় বড় জলের ফোঁটা।

স্বপ্না প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে এসে মধুময়ের মুখখানা দু' হাতে তুলে ধরে বলল, এই এই, কী হয়েছে তোমার! কী হয়েছে বল না। আমাকে বল—

মধুময় মুখ নীচু করে বলল, কিছু না, কিছু না, এমনিই হঠাৎ বোকার মতন।

স্বপ্না বলল, ভেঙে পড়ো না, লক্ষ্মীটি। একটা কিছু পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আর না পেলেই বা চাকরি! আমি তো রয়েছি। লক্ষ্মীটি শোন—

মধুময় চোখ মুছে ফেলল। সে যে ন্যায় অন্যায়ের দারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে, সে কথা বলা যাবে না স্বপ্নাকে। কারুকেই বলা যাবে না। এই একটা ব্যাপারে মধুময় দারুণ একা।

রতন একদিন বলল, এবার একটা বড় গোছের কাজে হাত দিতে হবে। তোরা রাজি আছিস?

দলের সবাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি। শুধু চুপ করে ছিল মধুময়। কথা হচ্ছিল রবারের কারখানার পিছনের মাঠে। মধুময় ভাবছিল এই দলে মেশা সে ছেড়ে দেবে। সে তার বিবেককে মোটেই বশ করতে পারছে না। তবু হঠাৎ সে বলে উঠল, যদি সত্যি খুব বড় কাজ হয়, তা হলে আমি রাজি আছি।

রতন মধুময়ের পিঠ চাপড়ে বলল, এই ছেলেটার হিম্মৎ আছে। এ একদম ভয় পায় না আমি দেখেছি।

কী কাজ রতনদা?

রাস্তাঘাটে লোকদের ল্যাং মারা বড় ছিচকে কাজ, ওতে আর আনন্দ নেই। এবার একটা বড় কাজ করলেই কয়েক মাস ফুর্তিতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কাজটা হচ্ছে লোকাল ট্রেনে ডাকাতি। ট্রেনের কোন একটা কামরায় উঠে দুটো খেলনা পিস্তল আর দুটো ছুরি নিয়ে ভয় দেখালেই বাঙালীরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তখন তাদের পকেটের মানি ব্যাগ আর হাতঘড়ি-টড়িগুলো খুলে নিতে বেশী সময় লাগে না। খুব সহজ কাজ। খবরের কাগজে এ রকম প্রায়ই বেরোয়। কেউ ধরা পড়ে না।

রতনের সাকরেদ ধনা বলল, শুধু খেলনা পিস্তল কেন ওস্তাদ? আর কিছু থাকবে না?

মধুময় বলল, রতনদা, আমার একটা কণ্ডিশান আছে, সেটা আগে থেকেই বলে রাখা দরকার।

কী?

এই কাজটা করার পর আমি তোমাদের দল একেবারে ছেড়ে দেব। আমার সঙ্গে তোমরা কেউ কোন দিন আর যোগাযোগ করতে পারবে না। আর, এই কাজে যতই টাকা উঠুক, আমাকে অন্তত সাড়ে তিন হাজার টাকা দিতেই হবে।

ধনা বলল, তুই বুঝি এখনো সেই বুড়ো লোকটাকে টাকা ফেরৎ দেবার কথা ভাবছিস? তুই পাগল নাকি রে?

মধুময় উত্তর দিল, সব মানুষেরই কিছু কিছু পাগলামি থাকে। ধরে নে, এটাই আমার পাগলামি।

রতন বলল, ঠিক আছে। মেনে নিলাম। তোকে আমি দেব ও টাকা।

ধনা 'হুররে' বলে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি একটা পাইপ গান জোগাড় করতে পারব।

রতন বলল, তাহলে তো আরও ভালো। দুখানা বড় ছুরি আমার নিজের কাছে আছে। মধুটার বেশ ষণ্ডা চেহারা আছে, তুই মধু একখানা ছুরি নিয়ে কামরার দরজার কাছে দাঁড়াবি।

মধুময় আপত্তি তুলল। সে বললে, কিন্তু রতনদা, এ তো নিরীহ লোকদের ওপরে ডাকাতি করা হবে। খারাপ লোকদের শাস্তি দেওয়া তো হবে না। ট্রেনের কামরায় তো আমাদের মতন লোকই থাকে।

ধনা বলল, ফার্স্ট ক্লাস না সেকেণ্ড ক্লাস?

রতন বলল, ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকে কোন লাভ নেই। ফার্স্ট ক্লাসে আজকাল বেশীর ভাগ লোকই পাসে যায় কিংবা বিনা টিকিটে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে দু-একজন মিলিটারি অফিসার থাকে, তাদের কাছে রিভলবার থাকতে পারে।

কথা থামিয়ে রতন মধুময়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, এ ছেলেটা ঠিকই বলেছে। নিরীহ লোকদের ওপর আমরা হামলা করব না। তবে, তোকে একটা কথা বলছি মধু, তুই কাগজে দেখেছিস, ট্রেনের কামরায় এ রকম ডাকাতি হলেই কোন একটা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ, সাত কি দশ হাজার টাকা খোওয়া যায়? লোকাল ট্রেনে একটা লোক এত টাকা নিয়ে যাতায়াত করে কেন? নিশ্চয়ই ব্ল্যাক মানি। গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করেছে ব্যবসার বড় বড় লেনদেন সব চেকে করতে হবে। তবু যারা পকেটে নোটের তাড়া নিয়ে ঘোরে, তাদের মতলব খারাপ নয়? তুই কী বলিস?

মধুময় বলল, তা ঠিক!

আমরা খবর রাখব···ট্রেনে ট্রেনে ঘোরাঘুরি করে কিছু লোককে ওয়াচ করব।

সাঁতরাগাছির দিকটা রতনের খুব চেনা। ওখানকার লাইনে পালানোর সব ঘোঁতঘাত সে জানে। কাজ হাঁসিল করার পর এক জায়গায় চেন টেনে ওরা ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে পালাবে।

আগে তিনবার ওরা সাঁতরাগাছির লোকাল ট্রেনে ঘুরে এলো। কোন রকম অসুবিধে নেই। চাল-স্মাগলাররা যখন তখন চেন টানে এ লাইনে। ট্রেনও দিব্যি ভালো ছেলের মতন থেমে যায়। আর্মড গার্ড-ফার্ড কিছু নেই। এদিকে কয়েকটা কোল্ড স্টোরেজ আছে। ব্যাগ ভর্তি তাড়া তাড়া নোট নিয়ে এ লাইনে প্রায়ই ব্যবসায়ীরা ঘোরাফেরা করে।

দিন ঠিক হল মে মাসের তিন তারিখ। দুপুর একটা চল্লিশের ট্রেন। ঐ সময় বেশির ভাগ লোকই ঝিমোয়। আর কামরায় গোলমাল হলেও পাশের কামরার লোকেরা শুনতে পাবে না।

দলে থাকবে পাঁচজন। রতন ধনা কল্যাণ বিশু আর মধুময়।

দুজন ব্যবসায়ীকে শেওড়াফুলিতে সকাল থেকে ফলো করবে রতন আর কল্যাণ। টাকা পয়সার খবর ঠিকঠাক থাকলে তবেই কাজ শুরু হবে।

* * *

সবই ঠিকঠাক মিলে গিয়েছিল। একটা বড় কামরায় আলাদা ভাবে ছড়িয়ে খুব নিরীহ ভাবে বসে ছিল ওরা। যেন কেউ কাউকে চেনে না। সকলের হাতে একটা কোন কাগজ কিংবা বই, যেন যে যার পড়াশুনো নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে।

তারপর এক সময় দু টা স্টেশনের মাঝখানে হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা পাঁচজন। রতনের গলাটাই সবচেয়ে বাজখাঁই, সে হুংকার দিয়ে বলে উঠল, খবর্দার, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। মধুময়ের হাতে ঝলমল করে উঠল একটা মস্ত বড় ভোজালি। সে দাঁড়াল দরজা আটকে।

কথা ছিল সাধারণের ঘড়ি মানিব্যাগ নেওয়া হবে না। কিন্তু কিছু যাত্রী ভয় পেয়ে নিজের থেকে তাদের ঘড়ি আর মানিব্যাগ ছুড়ে দিতে লাগল ওদের পায়ের কাছে। একজন ভদ্রমহিলা হাউ হাউ করে কেঁদে

উঠে নিজের হাতের চুড়ি খুলতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আমার ছেলেকে কিছু বোলো না। আমার একমাত্র ছেলে—

ধনাটা লোভীর মতন কুড়িয়ে নিতে লাগল সেই সব ঘড়ি মানিব্যাগ আর চুড়ি। রতন আর কল্যাণ দুজন যাত্রীর হাতব্যাগ ধরে টানাটানি করছে। এই সময় একটা যাত্রী হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চেন টেনে দিল। আর চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে।

বিশু তার বুকের কাছে খেলনা পিস্তল ঠেকিয়ে ধমকাতে লাগল, খবরদার! একদম চুপ! মেরে ফেলব একেবারে!

ট্রেন থেমে এলো আস্তে আস্তে। দুটো বাচ্চা ছেলে মধুময়ের বগলের ফাঁক দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

মধুময় তাদের আটকাতে পারল না। সে ভেবেছিল, অত বড় ভোজালিটা দেখেই সবাই ভয় পাবে। কিন্তু কেউ ভয় না পেলে তার গায়ে ভোজালির কোপ বসাবার কথা মধুময় চিন্তাই করে নি। ছেলে দুটো মধুময়কে ভয় পেল না কেন? তার মুখ দেখেই কি ওরা বুঝে গিয়েছিল যে সে কারুকে মারতে পারবে না? সে একজন শৌখিন ডাকাত?

রতন আর কল্যাণ তখনও ব্যাগ দুটো ছিনিয়ে নিতে পারে নি বলে মধুময় বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত।

এদিকে বাচ্চা দুটো মাটিতে নেমে চিৎকার করতে লাগল, ডাকাত! ডাকাত! মেরে ফেলল সবাইকে—মেরে ফেলল—!

রতন হুকুম দিল, রিট্রিট!

পাশের কামরাগুলো থেকে যাত্রীরা বেরুবার আগেই ওরা দৌড়াল মাঠের মধ্য দিয়ে। কিছু যাত্রী খানিকটা পথ তাড়া করে এলো বটে কিন্তু ওদের কেউ ছুঁতে পারল না।

প্রায় তিন মাইল দূরে একটা বাঁশঝাড়ের পাশে ওরা একটু বিশ্রাম নিতে বসল। তখন দেখা গেল ওদের মধ্যে একজন কম। পাঁচজনের মধ্যে চারজন এসেছে। বিশু নেই। বিশু কি তাহলে অন্য দিকে পালিয়ে গেল?

ধনা বলল, বিশেটাকে আমি কিন্তু মাইরি ট্রেন থেকে নামতে দেখি নি।

রতন তার কলার চেপে ধরে বলল, শালা, সে কথা তুই আগে বলিস নি কেন?

ধনা বলল, বললেই বা কি হত? তুই কি তাহলে ফিরে যেতিস তাকে আনতে?

বেচারা বিশু, খেলনার পিস্তল নিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

রতন বলল, এখানে বসে থাকলে আরও ডেঞ্জার আছে। এক্ষুনি সার্চ পার্টি আসতে পারে। চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়। নিজের বাড়িতে ফিরে যাস নি এখন। বিশুটা প্যাঁদানি খেয়ে নির্ঘাৎ সবার নাম বলে দেবে।

মধুময়ের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, বাড়ি ফিরব না? তাহলে আমি যাব কোথায়?

রতন জিজ্ঞেস করল, তোর কি অন্য কোথাও লুকোবার জায়গা নেই?

মধুময়ের চকিতে মনে পড়ে গেল স্বপ্নার কথা। নিজেদের বাড়িতে না ফিরে সে স্বপ্নার কাছে গিয়ে বলতে পারে, আমি ট্রেন ডাকাতি করে এসেছি। আমাকে তোমার কাছে লুকিয়ে রাখ।

সে ঘাড় নেড়ে বলল, না, নেই।

এই খেয়েছে! তাহলে কি হবে? বাড়ি ফিরলেই তো ধরা পড়ে যাবি। ঠিক আছে, তুই আয় আমার সঙ্গে।

তক্ষুণি উঠে ওরা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে। মধুময়ের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। এর আগে সে কখনো রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকে নি। ব্যাপারটার গুরুত্বও যেন সে বুঝতে পারে নি আগে। ধরা পড়া মানেই তো জানাজানি হয়ে যাওয়া। স্বপ্না জেনে যাবে যে সে ট্রেনে ডাকাতি করতে গিয়েছিল।

সে রতনকে জিজ্ঞেস করল, কত দিন আমরা বাড়ির বাইরে থাকব? বাড়ির লোকই তো পুলিশে খবর দেবে।

রতন বলল, দু'-তিন দিন ঘাপটি মেরে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াস নি।

রতনের সঙ্গে মধুময় বড় রাস্তায় এসে বাস ধরল। আধ ঘণ্টা বাদে সেই বাস থেকে নেমে আবার ধরল উল্টো দিকের একটা বাস। এই রকম ভাবে, প্রায় পাঁচবার গাড়ি বদল করে সন্ধ্যা নাগাদ তারা এসে পৌঁছাল হাওড়ায়।

ব্রীজ পেরিয়ে ওরা কিন্তু কলকাতায় এলো না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া শহরের মধ্যেই অনেক গলি ঘুরে ঘুরে থামল এসে একটা বাড়ির সামনে।

একটা খুব পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ওঠার পর রতন চেঁচিয়ে ডাকল, মুক্তো! ও মুক্তো—

তিরিশ বত্রিশ বছরের একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রতনকে বলল, কী ব্যাপার?

রতন এক গাল হেসে বলল, তোমার এখানে থাকব আজ, সঙ্গে এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।

মুক্তো নামে সেই স্ত্রীলোকটি বলল, থাকবে কি গো! বলা নেই কওয়া নেই হুট করে এসে থাকব বললেই কি হয়? আমার ঘরে আজ লোক আছে।

মধুময় এ সব কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না। এটা কি একটা হোটেল?

রতন বলল, তোমার ঘর আটকা? তাহলে ছাদে সেই যে ছোট একটা ঘর ছিল?

সেখানে থাকবে? কেন বাপু? মুখ দিয়ে এখনও দুধের গন্ধ যায় নি, বাড়ি যাও না! মা বাবা চিন্তা করবে না?

আঃ, বাজে কথা ছাড়, থাকতে দেবে কিনা বল না?

মুক্তো ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে একটা চাবি নিয়ে এলো। সেটা রতনের হাতে দিয়ে বলল, যাও, ঘর খুলে বস'গে। আমি যাব অখন এক সময়।

সিঁড়ি দিয়ে রতন আর মধুময় উঠে এলো ছাদে। একটা লম্বাটে ছোট্ট ঘর। চাবি খোলার পর দেখা গেল, সে ঘরের মেঝেতে একটা তেলচিটে মাদুর পাতা আছে শুধু, আর কিছু নেই।

মধুময় জিজ্ঞেস করল, এটা কার বাড়ি রতনদা? ঐ মেয়েটি তোমার আত্মীয়?

রতন বলল, সব আস্তে আস্তে টের পাবি। এখন মুখ বুঁজে থাক, বেশী কথা জিজ্ঞেস করিস না। তুই বাড়িতে না ফিরলে তোর বাড়ির লোক চিন্তা করবে?

তা তো করবেই। আমি অবশ্য বলে এসেছি, তারকেশ্বরে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি···আজ রাত্তিরে না ফিরলে ভাববে হয়তো সেখানে আটকে গেছি, কিন্তু কাল সকালে—

এখানে চার পাঁচদিন ঘাপটি মেরে থাকা দরকার···সব ব্যাপারটা কেঁচে গেল।

চার পাঁচদিন!

এ লাইনে এলে একটু ঝুঁকি নিতেই হয়।

রতনদা, তুমি আগে বল নি।

আগে কী বলব? তুই কি কচি খোকা? কিছু বুঝিস না?

মধুময় সত্যিই তো কচি খোকা নয়। তার তো জানা উচিত ছিল যে আগুনে হাত দিলে একবার না একবার হাত পুড়ে যেতেই পারে। মধুময় নিজের ডান হাতের পাঞ্জার দিকে তাকাল, সত্যিই যেন সেখান থেকে পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে।

রতন তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, আরে, এখনই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে হাত ব্যাগটা ছিনিয়ে আনতে না পারলেও কোন এক ফাঁকে রতন ছ'গাছি সোনার চুড়ি, তিনটি মানিব্যাগ আর তিনটে হাতঘড়ি ঠিক হাতিয়ে আনতে পেরেছে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রতন মানিব্যাগগুলো খুলে মাদুরের ওপর ঝাড়তে লাগল। সব মিলিয়ে তিনশো বারো টাকা আছে। একটা

মানিব্যাগের মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি। সেই ছবিটার দিকে তাকাতেই লজ্জা করল মধুময়ের।

রতন ছবিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল, আর যা কাগজপত্র ছিল সবই ছিঁড়ে ফেলে লুকিয়ে রাখল মাদুরের তলায়। ব্যাগগুলো নিয়ে সে কী করবে ভেবে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ছাদের কোণে একটা গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে রতন ব্যাগ তিনটেকে গেঁথে রাখল জলের তলার মাটিতে। তারপর নিশ্চিন্ত মুখ করে ফিরে এলো ঘরে।

একটা ঘড়ি সে নিজের হাতে পরে অন্য আর একটা ঘড়ি মধুময়কে দিয়ে বলল, পরে নে।

মধুময় ঘড়িটা ফেরৎ দিয়ে বলল, আমার দরকার নেই। তুমিই রাখো।

রতন বলল, আমি এতগুলো ঘড়ি নিয়ে কী করব? একটা রাখ তোর কাছে।

ঘড়িটা সে ছুড়ে দিল মধুময়ের কোলের ওপর।

বাকি ঘড়িটা আর সোনার চুড়িগুলো সে নিজের পকেটে রাখল।

টাকাগুলো থেকে গুণে গুণে সে একশো টাকা তুলে নিয়ে মধুময়ের হাতে দিয়ে বলল, এই টাকাগুলো তোর পকেটে রাখ। আজ দুপুরের ব্যাপারটা নিয়ে তুই মুক্তোকে কিছু বলবি না। যা বলার আমি বলব, তোকে আমি সাজাব একটা কয়লাখনির মালিকের ছেলে। আমি ওকে বলব—

রতনের তুলনায় মধুময় বেশী পড়াশুনো করেছে, সে খবরও রাখে অনেক বেশী। সে বলল, কয়লাখনির আবার এখন কোন মালিক আছে নাকি? সব খনি তো গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে।

রতন তাতে একটুও থতমত খেল না, সে অবহেলার সঙ্গে বলল, তোর ও সব ফ্যাকড়া তুলতে হবে না। মুক্তো ও সব কিছু বোঝে না। আমি বলব, তোকে নিয়ে আমরা এখানে ফুর্তি করতে এসেছি।

দেখিস, মুক্তো এই কথা শুনেই বলবে, ফুর্তি করতে এসেছ! এ লাইনে নতুন দেখছি! এই বলেই তোর থুতনিতে হাত দিয়ে একটু আদর করবে। তুই তখন ঐ পুরো একশো টাকা তুলে দিবি মুক্তোর হাতে। ছ্যাচড়ামি করে দু-একটা দশ টাকার নোট লুকিয়ে রাখিস না যেন, পুরোটাই দিবি, তাহলে দেখবি খুব খাতির করবে।

মধুময়ের শরীরে একটা শিহরণ লাগল। মুক্তোর জীবিকা কি, এখন তা বুঝতে আর কোন অসুবিধে নেই। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি যে কোন দিন এ রকম কোন বাড়িতে এসে সে রাত কাটাবে।

জায়গাটা রতনের বেশ পরিচিত দেখা যাচ্ছে। সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগল, হরিয়া, এ হরিয়া!

নীচ থেকে একজন সাড়া দিল, যাই—

একটু পরে একজন বেশ জোয়ান শক্ত সমর্থ চেহারার বুড়ো লোক উঠে এলো ছাদে।

রতন তাকে প্রথমে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, রুটি আর তড়কা এনে দাও তো হরিয়া। তারপর আরও একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, মুর্গীর মাংসও আনবে। আবার দুটো দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, আর তিন চার বোতল বীয়ার!

লোকটি চলে যেতেই রতন উপুড় হয়ে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল, আর একটু বাদেই তার নাক ডাকতে লাগল।

মধুময় বসে রইল গুম হয়ে। এক দিনের মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেল যে সে খানিকটা দিশাহারা বোধ করছিল। সে কিন্তু ঠিক ভয়ও পায় নি। বরং এই সব নিষিদ্ধ ব্যাপারে খানিকটা রোমাঞ্চই অনুভব করছিল মনে মনে। তিন চারদিন বাড়ি না ফিরলে বাড়িতে কী ধরণের হৈ চৈ হবে, কে জানে। সে যাই হোক, ফিরে গিয়ে মধুময় কোন রকমে সব ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। শুধু যেন স্বপ্নার কানে কোন কথা না যায়।

কিন্তু সেই সাড়ে তিন হাজার টাকা জোগাড় করা হল না। এ যাত্রা যদি মধুময় বেঁচেও যায়, আর এর পর এই লাইন একেবারে যদি ছেড়েও দেয়, তবু সারা জীবন তার মনের মধ্যে একটা গ্লানি থেকে যাবে। রাত্তির বেলার দিকে চৌরঙ্গিতে আবছা অন্ধকারে কোন ধনী লম্পটের পাশাপাশি কোন ভীরু লাজুক চেহারার বাঙালী মেয়েকে দেখলেই তার মনে হবে, সেই মেয়েটির দুর্ভাগ্যের জন্য মধুময়ই দায়ী।

* * *

হরিয়া খাবার নিয়ে এলো প্রায় ঘন্টা খানেক পরে। দুটো ভাঁড়ে মাংস আর তড়কা, ঠোঙার মধ্যে রুটি আর পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা, আর চার বোতল বীয়ার।

রতন প্রথমেই হরিয়াকে দুটো রুটি আর খানিকটা তড়কা আর মাংস তুলে দিয়ে বলল, এই নাও। খাও।

হরিয়া বলল, এ বাবু, হামাকে থোড়াসা বিয়ার পিলান।

যাও তোমার গেলাস নিয়ে এসো। আর, আমাদের জন্যেও দুটো গেলাস এনো।

রতন নিজে খেতে শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। মধুময় ঠিক শুরু করতে পারছে না। হাত-টাত ধোওয়া হয় নি। সারা গা ঘামে চিটচিট করছে। ভালো করে জল দিয়ে মুখ হাত না ধুতে পারলে তার খেতে রুচি হচ্ছে না।

রতন বলল, পেট ভরে খেয়ে নে মধু।

মধুময় অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল রতনের দিকে।

রতন বলল, দেখছিস কি, পেট খালি রাখলেই নানা রকম দুশ্চিন্তা আসে। দু-চারদিন আমরা এখানে খাব-দাব ঘুমোব, তারপর দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুময়েরও খুব খিদে পেয়েছিল। আর দেরি না করে সেও একটা রুটি তুলে নিয়ে মাংসের ঝোলে ডোবাল।

হরিয়া তিনটে গেলাস নিয়ে এসেছে। সে দরজার বাইরে বসে নিজের গেলাস থেকে চুক চুক করে বীয়ার খাচ্ছে।

কী—সব বীয়ার শেষ করে ফেললে? দরজা ফাঁক করে দাঁড়াল মুক্তো।

রতন বলল, না না, তোমার জন্যও রেখেছি। এই হরিয়া, আর একটা গেলাস।

মুক্তো বলল, গেলাস লাগবে না। বলে একটা বোতল তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে ঢালল গলায়। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ! আজ বড্ড খাটুনি গেছে।

মধুময় কিছুতেই বিস্ময় লুকোতে পারছে না মুক্তোকে দেখে। তার চোখ দুটি বিস্ফারিত। জীবনে এটা তার একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

মুক্তো পরে আছে শুধু একটা কালো শায়া আর একটা সাদা ব্রেসিয়ার। তার স্বাস্থ্য বেশ ভরাট, ব্রেসিয়ার উপচে বেরিয়ে আছে দুই স্তন। এই রকম পোশাকে কোন মেয়ে যে পুরুষদের সামনে আসতে পারে, সিনেমায় নয়, বাস্তব জীবনে, এ রকম ধারণাই ছিল না মধুময়ের। এ জন্য বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই মুক্তোর, এমন কি হরিয়ার মতন একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক যে বসে আছে, তা-ও সে গ্রাহ্য করছে না।

আজ আবার এ কাকে নিয়ে এসেছ? মুক্তো প্রশ্ন করল রতনকে।

রতন বলল, এ আমার এক বন্ধু, একটা কয়লাখনির মালিকের ছেলে……

মুক্তো খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার স্তন দুটি কাঁপতে থাকে।

নতুন যে আসে, সে-ই তো শুনি কয়লার খনির মালিকের ছেলে। দেশে কত কয়লার খনি আছে গা?

মধুময় ততক্ষণে পকেট থেকে সেই একশোটা টাকা বার করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে মুক্তোর দিকে।

বাপের পকেট মারা হয়েছে বুঝি? আসতে না আসতেই টাকা দিচ্ছ যে—

মধুময় এরপর আর কি কথা বলবে বুঝতে পারল না। সে মুক্তোর দিকে বেশি ক্ষণ চেয়ে থাকতেও লজ্জা পাচ্ছে। সে চোখ নামিয়ে নিল।

সে মন দিয়ে দেখতে লাগল নিজের ডান হাতের পাঞ্জাটা। তার হাতের রং আগে তো এ রকম ছিল না, ঠিক পোড়াটে কালো রং। সে স্পষ্ট অনুভব করছে চামড়া পোড়া গন্ধ।

মুক্তো বসে পড়ল ওদের গা ঘেঁষে। শায়াটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে সে বলল, যা গরম, এ ঘরে তোমরা দুজনে থাকবে কি করে? এই হরিয়া, এখানে বসে বসে বীয়ার গিলছিস, লজ্জা করে না? যা, আমার দোতলার ঘরটা সাফ করে দে তাড়াতাড়ি। এমন একটা টেঁটিয়া লোক এসেছিল কিছুতেই যেতে চায় না, তার ওপর আবার বমি করে ঘর ভাসিয়েছে!

হরিয়া চলে যেতেই মুক্তো মধুময়কে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ভাই?

মধুময় রতনের দিকে তাকাল। এখানে সত্যি নাম বলতে হয় না বানিয়ে বলতে হয়, তা সে জানে না।

মধুময়ের দ্বিধা দেখে মুক্তো বলল, ঠিক আছে, তোমার নাম বলতে হবে না, আমিই তোমার নাম দিয়ে দিচ্ছি। তোমার নাম দিলাম আমি নাড়ুগোপাল!

বলেই সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মধুময়ের বুকে। দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কি—আমাকে পছন্দ নয়?

মধুময়ের এইটুকু জীবনে কোন নারী তার এত ঘনিষ্ঠ হয় নি। কারও স্তনের স্পর্শ লাগে নি তার বুকে। কেউ তার গলা জড়িয়ে ধরে নি এমন ভাবে।

স্বপ্না ছাড়া আর কোন মেয়ের সঙ্গে মেশে নি সে। স্বপ্নার সঙ্গে এ রকম শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা কল্পনাই করা যায় না।

উত্তেজনায় তার চোখের কোণ চিবুক ও কানের লতিতে যেন জ্বালা করতে লাগল। সে কোন কথা বলতে পারল না।

কি—তোমার বন্ধুটি বোবা নাকি গো?

রতন বলল, প্রথম দিন এসেছে তো, তাই লজ্জা পাচ্ছে।

রতন মুক্তোর কোমরে হাত দিয়ে তাকে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। এবার মুক্তো মধুময়কে ছেড়ে অবলীলাক্রমে মাথা রাখল রতনের বুকে। তারপর বলল, একটা সিগারেট দাও না মাইরি!

রতন মুক্তোর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিতেই সে বলল, ধরিয়ে দাও।

এক হাতে সিগারেট আর এক হাতে বীয়ারের বোতল নিয়ে সে রতনের বুকে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। বীয়ার ও সিগারেট দুটোই শেষ করার পর সে উঠে বসল আবার। ব্যস্ত হয়ে বলল, অনেক রাত হয়ে গেল। তোমরা তো দিব্যি খেয়ে নিয়েছ। আমায় খেতে হবে না? খিদে পেয়েছে।

নিজের বুকের ওপর থেকে রতনের হাতটা সরিয়ে দিয়ে মুক্তো বলল, তোমরা সারা রাত থাকবে তো? নীচে আমার ঘরে তোমাদের মধ্যে একজন চল, আর একজন এখানেই ঘুমাও। একটা বালিশ পঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর মধুময়ের দিকে চেয়ে বলল, এই নাড়ুগোপাল তো আজ নতুন এসেছে, ও-ই আমার সঙ্গে চলুক আজ।

রতন বলল, কেন, আমরা তিনজনেই তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকি না?

মুক্তো বলল, উঁহু। ও সব চলবে না। বললুম না, আজ বড্ড খাটুনি গেছে, আজ আর ও সব পারব না।

রতন বলল, আমি চুপচাপ পাশে শুয়ে থাকব।

তোমাকে আমি চিনি না। তুমি মহা ফেরেব্বাজ।

মুক্তো উঠে দাঁড়িয়ে মধুময়ের হাত ধরে বলল, এসো নাড়ুগোপাল, চল।

রতন বলল, ঠিক আছে, ও-ই যাক, আমরা কয়েকদিন থাকছি এখানে।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মধুময় একবার অসহায় ভাবে তাকাল রতনের দিকে।

রতন হাসতে হাসতে বলল, দেখিস, সাবধান! মুক্তো যেন তোকে কাঁচাই খেয়ে না ফেলে! ও কিন্তু তা পারে।

মুক্তো বলল, মারব ঝ্যাঁটা!

ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতন মধুময়ের হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মুক্তো। মধুময় সম্পূর্ণ নির্বাক।

দোতলার ঘরখানা জিনিসপত্রে ঠাসা। একটা আলমারি একটা ড্রেসিং টেবল একটা বড় খাট। ড্রেসিং টেবিলের কাচটা বাজে, মুখ লম্বা দেখায়।

মুক্তো মধুময়কে খাট দেখিয়ে বলল, একটু বস, আমি আসছি।

মধুময় আড়ষ্ট ভাবে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ঘরখানা। দেয়ালে পুরনো ক্যালেণ্ডারের অনেকগুলো ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা। সবই শিব দুর্গা কালি— এই সব ঠাকুর দেবতার ছবি। ঘরে কি রকম যেন একটা আঁশটে গন্ধ, দুটো জানালা, দুটোই বন্ধ।

মুক্তো ফিরে এলো একটু বাদেই। তারপর খাটের তলা থেকে টেনে বার করল কয়েকটা বাটি আর ডেকচি। সেগুলোর ঢাকা খুলতেই দেখা গেল তাতে রয়েছে ভাত, ডাল, তরকারি আর মাছ।

মাটিতে বসে পড়ে মুক্তো বলল, ও নাড়ুগোপাল, একটু খাবে কিছু?

মধুময় বলল, না, আমি খেয়েছি। আপনি খান।

মুক্তো একগাল হেসে বলল, ও বাবা, আপনি, আজ্ঞে! শোন বাবু, এখানে ও সব চলে না। আমাকে তুমি বল। অনেকে তো তুই তোকারি করে। খাবে না আমার সঙ্গে? আমার হাতের ছোঁয়া বুঝি খেতে নেই? তোমরা আর সব পারো, শুধু হাতের ছোঁয়া খেলেই তোমাদের জাত যায়।

না, সে জন্য নয়। আমি সকলের ছোঁয়া খাই। কিন্তু একটু আগেই তো অনেক খেলাম।

তাও একটু খেয়ে দেখ, আমি কেমন রেঁধেছি। আমি বাপু নিজে রাঁধি, দোকানের কেনা জিনিস পারতপক্ষে খাই না।

ডাল, আলু-সজনে ডাঁটার তরকারি আর পার্শে মাছ। ঠিক মধুময়দের বাড়ির রান্নার মতন। ঠিক মাসী পিসীদের মতনই মুক্তো জোর করে তাকে বলতে লাগল, আর একটু ভাত নাও। আর একটা মাছ দেব?

মুক্তো মধুময়ের চেয়ে অন্তত দশ বারো বছরের বড়।

খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দাতেই বালতিতে রাখা জলে ওরা হাত ধুয়ে নিল।

মুক্তো জিজ্ঞেস করল, তুমি ঐ সব পরেই শোবে নাকি? একটা শাড়ি দেব—লুঙ্গির মতন করে জড়িয়ে নেবে?

মধুময় বলল, না না, তার দরকার নেই।

মধুময় পরে আছে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। সে জীবনে কখনো লুঙ্গি পরে নি। একটি অচেনা মেয়ের শাড়ি পরে সে শোবে। এই ধারনাটাই তার কাছে অদ্ভুত লাগে। এতক্ষণ বাদে মধুময় ভয় পাচ্ছে। যেন এবার একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটতে যাবে।

এতক্ষণ তার অনুভূতি যেন সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে ছিল। এখন সে হঠাৎ উপলব্ধি করল যে তাকে নীচে আনা হয়েছে এই মুক্তো নামের মেয়েটির সঙ্গে এক ঘরে শোবার জন্য। তা কি সম্ভব? এই স্ত্রীলোকটিকে সে কয়েক ঘণ্টা আগেও চিনত না।

মুক্তো একটু হাই তুলতে গিয়েও চেপে গেল। তারপর খানিকটা জোর করে হাসি টেনে বলল, এখন গল্প করবে, না শোবে?

মধুময় বলতে চাইল, আমি ওপরে চলে যাই। আমি রতনের পাশে শুয়ে থাকতে পারব। গরমে আমার কষ্ট হবে না। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না।

তুমি পান খাও?

না।

আমিও খাব না। একটা সিগারেট দাও বরং।

আমার কাছে তো সিগারেট নেই। ওপর থেকে নিয়ে আসব?

না, থাক। আর আনতে হবে না। এবার তাহলে আলো নিভিয়ে দিই?

মধুময় হঠাৎ আড়ষ্ট গলায় বলে উঠল, আমি বাইরে শোব।

মুক্তো ভুরু দুটো তুলে জিজ্ঞেস করল, বাইরে শোবে? কেন?

মধুময় বলল, বাইরে শুতেই আমার ভালো লাগবে। বারান্দায় তো অনেক জায়গা আছে।

মুক্তো বলল, বারান্দায় শোবে? তাহলে মাঝ রাত্তিরে কী হবে জানো? তোমায় ভূতে ধরবে! বলেই হি হি করে খুব জোরে হেসে উঠল মুক্তো।

মধুময় তবুও দৃঢ়ভাবে বলল, না, আমি বাইরেই শোব, আমার কিছু হবে না।

মুক্তো হাসি থামিয়ে বলল, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? রাত দুপুরে তোমায় বারান্দায় দেখলে এ বাড়ির চাকররা ভাববে আমি তোমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তখন তারা তোমায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। দুষ্টুমী করো না, লক্ষ্মী ছেলের মতন শুয়ে পড়।

মধুময় অসহায় ভাবে, প্রায় মিনতির সুরে বলল, তাহলে আমি ঘরের মধ্যেই মাটিতে শুচ্ছি। আমার বিছানা লাগবে না।

মুক্তো এবার মধুময়ের মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কেন গো নড়ুগোপাল? আমায় ভয় পাচ্ছ? আমি কি সত্যি তোমায় খেয়ে ফেলব নাকি? আলো নিভিয়ে দিচ্ছি, আর দেরি করতে পারছি না।

কিন্তু আলো নেভাবার আগেই মুক্তো তার শায়া আর ব্রেসিয়ার খুলে ফেলল চট করে। মধুময় চোখ বুজে ফেলল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

সে আগে অনেক মেয়ের ছবি এঁকেছে। এমন কি নগ্ন মেয়েদের ছবিও এঁকেছে কয়েকখানা। কিন্তু কখনো বাস্তবে দেখে নি। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলো দেখে নকল করেছে সে। সেইগুলো আঁকবার সময়ই তার শরীর ঝিম ঝিম করত। বাথরুমে ছুটে গেছে অনেকবার। এখন চোখের সামনে একটি বাস্তব গোটা নগ্ন রমণী দেখে সে যেন ঠিক সহ্য করতে পারল না। ঘরের মধ্যে বড্ড চড়া আলো। এই আলোটা ঠিক নয়। একটা হাল্‌কা নীল আলো জ্বালা থাকলে সে মুক্তোর ছবি আঁকতে পারত।

মুক্তো আলনা থেকে একটা ছাপা শাড়ি টেনে জড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর টুপ করে আলো নিভিয়ে খাটে উঠে এসে মধুময়কে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার নাড়ুগোপাল, সত্যিই নাড়ুগোপাল!

মধুময় শুয়ে রইল কাঠ হয়ে। তার শরীর দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু মুক্তোর শরীরটা খুব ঠাণ্ডা। সে যেন স্নেহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে মধুময়কে। এই অবস্থাতেও মধুময় মনে মনে ঠিক যেন জপ করার ভঙ্গিতে বলল, স্বপ্না, আমি কি পাপ করছি? তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা করবে না? আমি এতটা বুঝতে পারি নি। বিশ্বাস কর, আমি বুঝতে পারি নি।

মধুময় খুব সন্তর্পণে নিজেকে মুক্তোর আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল।

মুক্তো বলল, তোমার কিছু ইচ্ছে করছে না বুঝি? তাহলে বাপু আজ লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়। আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে। যা খাটুনি গেছে সারাদিন!

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল মুক্তো।

মধুময়ের চোখ খরখরে। যেন তার সারা রাত ঘুম আসবে না কিছুতেই। শুয়ে শুয়ে সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। রতনদের সঙ্গে মিশে সে কিছু কিছু নিষিদ্ধ কাজ ও কথাবার্তায় বেশ আনন্দই পেত। কারণ, তাদের বাড়ির আবহাওয়া বড় মার্জিত। মধুময় বাড়ির বাইরে এসে একটা অন্য রকম স্বাদ পেয়েছিল এই প্রথম।

ছোটখাটো বেআইনী কাজেও সে কোন অন্যায় দেখে নি। কারণ এতদিন বেকার থেকে সে বুঝেছিল, এই সমাজ বেকার তৈরি করে কিন্তু বেকারদের সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেয় না। যে কোন উপায়েই হোক, এই সমাজকে একটা আঘাত দেওয়া দরকার। বাড়ির কড়া শাসনে মধুময় কখনও কোন রাজনৈতিক দলে ভিড়তে পারে নি। সেই জন্য ও ব্যাপারে তার কোন স্পষ্ট ধারনাও নেই।

রতনের দুর্দান্তপনা ও দুঃসাহস তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু রতনের এদিকের জীবনটার কথা সে কোন দিন ঘুণাক্ষরেও জানে নি। এ জীবনে সে আসতে চায় নি কখনও। রতনদের তো স্বপ্না নেই, তার আছে।

মধুময় একবার ভাবল, চুপি চুপি উঠে পড়ে সে এখান থেকে পালিয়ে যায়। এদিককার রাস্তা সে চেনে না, ঘুরতে ঘুরতে কোন রকমে বাড়ি পৌঁছতে পারবেই। তারপর সে আর রতনদের সঙ্গে মিশবে না। এই কয়েক মাসের ঘটনা সে তার জীবন থেকে মুছে ফেলবে।

কিন্তু বাড়িতে যদি পুলিশ আসে? পুলিশের নামেই মধুময়ের বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ তাকে মারবে কিংবা জেল খাটাবে, এজন্য সে ভয় পায় না। কিন্তু পুলিশে ধরা পড়া মানেই সব কিছু জানাজানি হয়ে যাওয়া। তাদের দলের একজন ধরা পড়ে গেছে, সে হয়তো অন্যদের নাম বলে দেবে। পুলিশ অমনি ঠিকানা পেয়ে যাবে মধুময়ের। এ ব্যাপারে রতনের অভিজ্ঞতা বেশী। রতনের কথা শুনেই চলা উচিত এখন। ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করতে গেলে মধুময় হয়তো আরও বেশী বিপদে পড়বে।

গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একদিন মধুময় স্বপ্নাকে নিয়ে অন্ধকার ময়দানে বসে ছিল। অন্ধকারে বসার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু একটু নিরিবিলি পাওয়া সেখানে বসে বসে গল্প, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। স্বপ্নার সঙ্গে গল্প করার জন্য কখন কোন বিষয়ের কথা চিন্তা করতে হয় না। হঠাৎ সামনে একটি পুলিশ এসে উপস্থিত।

সেই পুলিশটি বিশ্রী গলায় বলেছিল, এখানে বসে অসভ্যতা করা হচ্ছে, অ্যাঁ ?

পুলিশ তো আর স্বপ্নাকে চেনে না, সেজন্যই ও রকম কথা বলতে পেরেছিল। স্বপ্নার সঙ্গে অসভ্যতা ? মধুময়ের হাজার ইচ্ছে থাকলেও স্বপ্না একবারও তাকে জড়িয়ে ধরতে দেয় নি পর্যন্ত !

পুলিশ দেখে সেদিনও মধুময় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নার মনের মধ্যে তো কোন অন্যায় বোধ নেই, তাই সে পুলিশকে গ্রাহ্য করে নি। সে বলেছিল, আজে বাজে কথা বলছেন কেন ? মাঠের মধ্যে বসা কি অপরাধ ?

পুলিশটি বলেছিল, সে কথা থানায় গিয়ে বড়বাবুকেই জিজ্ঞেস করবেন। এখন চলুন থানায়।

স্বপ্না সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, চলুন !

মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসবার পর পুলিশটিই বলেছিল, আজ ছেড়ে দিলাম, বাড়ি যান। আর ও রকম করবেন না।

স্বপ্না বলেছিল, ছেড়ে দিলাম মানে ? আমরা থানাতেই যেতে চাই। আমরা আপনার বড়বাবুকেই জিজ্ঞেস করব, মাঠে বসা অপরাধ কি না।

তখন পুলিশটিই পালিয়ে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই আশা করেছিল ওদের কাছ থেকে কিছু ঘুষ পাবে। নিশ্চয়ই ভেবেছিল থানায় যাবার নাম শুনলেই ওরা ভয় পেয়ে তার কাছে কাকুতি মিনতি করবে।

কিন্তু এখন তো মধুময় পুলিশ দেখলে জোর দিয়ে বলতে পারবে না, চলুন থানায়, আমি কোন অন্যায় করি নি।

মুক্তোর মতন একটি বেশ্যার পাশে শুয়ে শুয়ে মধুময় স্বপ্নার কথা ভাবছে ? ছি, ছি, এতে তো স্বপ্নাকেই অপমান করা হয়।

অবশ্য মুক্তো মেয়েটি এ পর্যন্ত তার সঙ্গে কোন রকম খারাপ ব্যবহার করে নি। তবু মধুময় ওর স্পর্শ বাঁচিয়ে আরও খানিকটা দূরে সরে গেল।

বহুক্ষণ পর্যন্ত জেগেই রইল মধুময়। শেষ রাত্রের তন্দ্রায় সে একটা স্বপ্ন দেখল। মধুময় বাড়ি ফিরে গেছে, খুব হাসছে। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, তুই লুকিয়ে লুকিয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিলি কবে? আমরা কিছু জানতে পারি নি! একেবারে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস! এবার তো তোর চাকরির জন্য চিন্তাই করতে হবে না। গভর্ণমেণ্ট তোকে ডেকে ডেকে চাকরি দেবে!

পরদিন ঘুম ভেঙেই ধড়ফড় করে উঠে বসল মধুময়। তার সত্যিই ধারণা ছিল, সে তার বাড়ি ফিরে গেছে। কিন্তু না, এটা মুক্তোর ঘর। মুক্তো উঠে গেছে বিছানা থেকে। চুল আঁচড়াচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এরই মধ্যে স্নান হয়ে গেছে তার।

একটু পরেই নীচে নেমে এলো রতন। পিছন থেকে মুক্তোকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাল কেমন জমেছিল, অ্যাঁ? নাড়ুগোপালকে ঠিক মতন হাতে খড়ি দিয়েছ তো?

মুক্তো এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে রুদ্ধ গলায় বলেছিল, দিলে তো ছুঁয়ে? আবার আমায় চান করতে হবে। জানো না, সকালবেলা পূজো না করে আমি কোন পুরুষ মানুষ ছুঁই না!

রতন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, মাফ চাইছি ভাই। একটু চা তো খাওয়াবে অন্তত। না কি সেও পাবো পূজোর পরে?

তারপর সবেমাত্র চা খেতে বসেছে ওরা তিনজনে, এমন সময় পুলিশ এলো।

পুলিশ ওদের মারধোর করে নি। রতনের পকেটে যা জিনিস-পত্র পাওয়া গেছে তাই-ই যথেষ্ট। ওদের এনে পুরে দেওয়া হল লালবাজার লক-আপে।

* * *

পরদিন কাগজে বড় বড় করে ছাপা হল, পাঁচজন কুখ্যাত ডাকাতের গ্রেপ্তার কাহিনী। এই দলটি নাকি ইতিমধ্যে সাতবার ট্রেন ডাকাতি করেও সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, এবার ধরা পড়েছে পুলিশের তৎপরতায়।

মধুময়ের বাবা খবর পেয়ে প্রথমে পুলিশকে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে এ কাজ করেছে, এটা হতেই পারে না। পৃথিবী উল্টে গেলেও তিনি এ কথা বিশ্বাস করবেন না।

পুলিশ তাঁকে নিয়ে এলো আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। বাবা মধুময়ের চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। একটাও কথা বললেন না। একটু পরে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। পুলিশকে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিই যে এ ছেলের জন্ম দিয়েছি, তা অস্বীকার করতে পারি না।

বাবা নাকি তারপর বাড়ি ফিরে বলেছিলেন, ও ছেলের যা শাস্তি হয় হোক, আমি ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই। আমি ওকে ছাড়াবার কোন চেষ্টাই করব না।

কিন্তু মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। মধুময়ের এক মামা বেশ বড় উকিল। তিনি এলেন সাহায্য করবার জন্য।

মধুময় জামীন পেল না। কিছুদিন বাদে লালবাজার থেকে সরিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

মামলা চলল এগারো মাস। একই মামলার পাঁচজন আসামী হলেও মধুময়ের বড় মামা লড়তে লাগলেন শুধু একা মধুময়ের হয়ে। তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে ঐ দিন সাঁতরাগাছির কাছে ডাকাতির সময়ে মধুময় ঐ ট্রেনে থাকতেই পারে না, কারণ সে তখন একটি মারোয়াড়ি কোম্পানিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। সেই অনুযায়ী তিনি এগারোজন সাক্ষী হাজির করালেন। প্রত্যেকেই বলল, সেদিন তারা মধুময়কে ইন্টারভিউ দিতে দেখেছে। মধুময়ের নামে একটা ছাপানো ইন্টারভিউয়ের চিঠিও দাখিল করা হল কোর্টে।

বড় মামা তীব্র ভাষায় বললেন, বাকি যে আরও ছ'টা ডাকাতির অভিযোগ এদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি ডাকাতির সময় মধুময় কলকাতাতেই ছিল না, সে পাটনায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত তার অকাট্য প্রমাণ আছে। পুলিশ আসল অপরাধীদের ধরতে পারে না, শুধু শুধু নিরীহ ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়।

পুলিশ পক্ষ থেকে সাক্ষী ডাকা হয়েছিল মুক্তোকে।

মুক্তো বলেছিল, কে জানে বাপু, আমার ঘরে প্রতি দিনই দু-তিনজন করে লোক আসে, সকলকে চিনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একে আমি আগে দেখেছি কি না মনে করতে পারছি না।

মধুময়ের তখন এক মুখ দাড়ি।

পুলিশ থেকে নানা রকম ভয় দেখানো হয়েছিল, তবু মুক্তো কিছুতেই মচকায় নি। শেষ পর্যন্ত বেশী জেরার উত্তরে সে দৃঢ়স্বরে বলেছিল, না, আমি একে চিনি না, একে কোন দিন দেখি নি।

মধুময়ের দাড়ি কামানো আগেকার ছবি দেখানো হল, মুক্তো তখন হাস.ত হাসতে বলেছিল, এইটুকু ছেলে? আমার ঘরে? আমার যে এর ডবল বয়েস, হি-হি-হি-হি।

বিচারক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন তাকে।

জেলে থাকার সময় উৎকট রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল মধুময়। কথা বলত না কারুর সঙ্গে। এমন কি রতন, প্রসাদের সঙ্গেও সে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিল, সর্বক্ষণ সে ভুরু কুঁচকে চিন্তা করত। সে যাচাই করে দেখত তার জীবনের ভুলগুলো।

প্রায় এগারো মাস বাদে, যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেল মধুময়।

প্রথম দিকে বাবা মধুময়ের আর মুখই দেখতে চান নি, কিন্তু তিনিই জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন মধুময়কে। তিনিই সস্নেহে বলেছিলেন, যা হয়ে গেছে, ও সব আর মনে রাখিস না। সব ভুলে যা।

তার মা ও বোনেরা মধুময়ের প্রতি অতিরিক্ত খাতির দেখাতে লাগল। কেউ এমন একটা কথাও বলল না, যাতে করে মধুময় দুঃখ পেতে পারে। বরং সকলে তাকে সহানুভূতি দেখাতে লাগল এই বলে যে, এতদিন জেলখানায় থেকে কষ্ট পেয়ে মধুময়ের শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

প্রথম কয়েক দিন মধুময় বাড়ি থেকে বেরুতে পারে নি লজ্জায়। মা বলেছিলেন, তুই কেন লজ্জা পাবি মধু? তোর কি শাস্তি হয়েছে? কোর্ট থেকে তোকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। পুলিশ যা-তা একটা বদনাম দিয়ে লোককে ধরে নিয়ে গেলেই কি লোকে তা বিশ্বাস করবে?

আইনের চোখে মধুময় নিরপরাধ ঠিকই। তার কোন শাস্তি হয় নি। সে এই কথাটা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে। কিন্তু তার বাড়ির সব লোক জানে, মধুময় সত্যিই ট্রেন ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সে ধরা পড়েছিল একটি কুখ্যাত বেশ্যাপল্লীর মধ্যে, সকালবেলা, একটি মেয়ের ঘরে। সে ছাড়া পেয়েছে, শুধু তার বড় মামার ওকালতি বুদ্ধির জোরে। স্বপ্নাও জানে।

মধুময় জেল থেকে বেরুবার পর প্রায় এক মাস যায় নি স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করতে। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, স্বপ্না নিজে থেকেই বোধ হয় একবার আসবে। প্রায় এক বছর দেখা হয় নি স্বপ্নার সঙ্গে, ওর কি মন কেমন করে না?

স্বপ্না আসে নি, চিঠিও লেখে নি।

তারপর মধুময় নিজেই একদিন বেরিয়ে পড়েছিল। তাকে তো নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হবে। দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকলে তো আর চলবে না।

বড়মামা একটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন বাবাকে। মধুময়কে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হোক বোম্বাইতে। সেখানে আছেন মেজো মামা। তিনি চেষ্টা করলে মধুময়ের জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবেন। যতদিন চাকরি না জোটে, ততদিন বোম্বাইতে

থাকলেও মধুময়ের অনেকটা উপকার হবে। এখানে সে লজ্জায় লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারবে না হয়তো। কিন্তু বোম্বাইতে তো সে রকম কোন অসুবিধে নেই!

মা মধুময়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই বোম্বেতে যাবি?

মধুময় বলেছিল, ভেবে দেখি।

নতুন ভাবে জীবন শুরু করার আগে স্বপ্নার ব্যাপারটা ঠিকঠাক করা দরকাব। জেলে বসে মধুময় অনেক চিন্তা করে দেখেছে, স্বপ্নাকে বাদ দিয়ে সে জীবন কাটাতে পারবে না। স্বপ্না আঘাত পায়, এমন কোন কাজ করা উচিত নয় তার পক্ষে।

স্বপ্না কি তাকে ক্ষমা করবে না? একবার সে ভুলের পথে গিয়েছিল, এখন সে ফিরে আসতে চাইলে স্বপ্না কি মেনে নিতে পারবে না তাকে?

পর পর দু'দিন গিয়ে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয় নি। দু'দিনই স্বপ্নার দাদার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল মধুময়। স্বপ্নার দাদা আগে তার সঙ্গে বেশ ভালো ভাবেই কথা বলত, কিন্তু এখন গম্ভীর। অর্থাৎ এ ও সব জানে।

স্বপ্নার দাদা বলেছিল, স্বপ্না তো বাড়িতে নেই—

তখনই মধুময়ের সন্দেহ হয়েছিল যে স্বপ্নার দাদা মিথ্যে কথা বলছে। স্বপ্না বাড়িতে থাকলেও মধুময়ের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না।

কিন্তু মধুময়কে তো দেখা করতেই হবে।

কয়েক দিনের মধ্যে দেখা হলও। প্রথমবার স্বপ্না ঠিক মুখের ওপর খারাপ ব্যবহার করতে পারে নি। বলেছিল, তোমার চেহারাটা অন্য রকম হয়ে গেছে। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে চিনতেই পারতাম না!

মধুময় নিজেই প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে নি। এত দিন পর স্বপ্নাকে দেখা মাত্র তার কান্না এসে গিয়েছিল। সে আবার টের পেয়েছিল, স্বপ্না তার ভুবনের কতখানি জুড়ে আছে। এ যেন শুধু প্রেম ভালোবাসা নয়, স্বপ্নার কাছে গচ্ছিত আছে তার আত্মার একটা টুকরো। এ কথা মধুময় ভুলে গিয়েছিল।

মধুময়কে এড়াবার জন্য স্বপ্না বলেছিল, তুমি আজই এলে? আমায় যে এক্ষুনি বেরুতে হবে—

প্লেন কিংবা ট্রেন ধরার ব্যাপার থাকলে দেরি করা যায় না। এ ছাড়া আর কোন্ কারণে এক্ষুনি বেরুতে হবে স্বপ্নাকে? কোন সিনেমা থিয়েটারে যাবার কথা থাকলে স্বপ্না কি তা সেদিনকার মতন বাতিল করতে পারে না? এমন কি, জরুরি কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলেও মধুময়েব জন্য স্বপ্না কি থেকে যেতে পারে না?

তুমি কোথায় যাবে?

আমার একটা দরকার আছে।

স্বপ্না এর বেশী আর কিছু বলতে চায় নি।

মধুময়ও জিজ্ঞেস করে নি। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। তাই বলেছিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে?

কোন্ চিঠি?

জেল থেকে আমি তোমাকে লিখেছিলাম।

না তো।

জেলখানা থেকে চিঠি অনেক সময় সেন্সর করে থাকে। কিন্তু মধুময়ের চিঠিতে তো সে রকম কিছু ছিল না। সবই ব্যক্তিগত কথা।

একটা নয়, তিনখানা চিঠি লিখেছিল মধুময়। শুধু স্বপ্নাকেই। নিজের বাড়িতে সে কোন চিঠি লেখে নি। সে চিঠি স্বপ্না পায় নি। স্বপ্না তো সহজে মিথ্যে কথা বলে না। তাহলে কি স্বপ্নার বাড়ির লোকেরা সে চিঠি পেয়ে স্বপ্নাকে দেয় নি! জেলখানা থেকে পাঠানো চিঠি দেখলেই বোঝা যায়।

সেই তিনখানা চিঠিতেই মধুময় লিখেছিল, আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই। একবার ভুল করলে কি মানুষ ফিরতে পারে না?

সেদিন স্বপ্না বেশীক্ষণ থাকে নি, কিন্তু মধুময়কে বলেছিল, তুমি আর এক দিন এসো। আর এক দিন—বলে নি যে কালই এসো।

তবু মধুময় পর দিনই গিয়েছিল আবার। স্বপ্না সেদিন সত্যিই বাড়ি ছিল না।

স্বপ্না কী করে জানবে যে মধুময় তার পর দিনই আসবে!

আজ স্বপ্না স্পষ্ট মুখের ওপব বলে দিল, তুমি আব এসো না!

স্বপ্না তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে চাইছে। দশ বারো বছরের সম্পর্ক, মধুময় তখনও হাফ প্যান্ট ছাড়ে নি স্বপ্না তখনও ফ্রক পরে, সেই সময় থেকে ওরা পরস্পর বন্ধু থাকাব জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল।

দেশপ্রিয় পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মধুময়। সে এখন কোন্ দিকে যাবে? তার সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে।

সে আবার অসামাজিক জীবনে ফিরে যেতে পারে। আগের বারের ভুল থেকে সে শিক্ষা নেবে। দ্বিতীয়বার ট্রেনে ডাকাতি করতে গেলে আর ভুল হবে না। না হয়, ধরা পড়ে দু-এক বছর জেল খাটবে তবু ঐ জীবনে রোমাঞ্চ আছে। ঐ জীবনেব সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মুক্তোর মতন মেয়েবা।

অথবা সে যেতে পারে নতুন একটা সুন্দর জীবনের দিকে। বোম্বাইতে গিয়ে চাকরি। নতুন ফ্ল্যাট। কিছু টাকা জমিয়ে বিয়ে। অথবা বিয়ে না করে ব্যাচিলরের সুখী জীবন। বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, জুয়াখেলা, মদ।

স্বপ্নাকে ছাড়া আর কোন মেয়েকে বিয়ে করা কি তার পক্ষে সম্ভব? কিংবা বিয়ে করা বা না করারও প্রশ্ন নয়। স্বপ্না তাকে বাদ দিয়েও জীবন কাটাবাব কথা চিন্তা কবতে পারে। কিন্তু মধুময়ের পক্ষে তা কি সম্ভব? স্বপ্না জানে না যে তার কাছে গচ্ছিত আছে মধুময়ের আত্মার খানিকটা অংশ।

এখন সব কিছুই নির্ভর করছে স্বপ্নার ওপরে।

॥ দুই ॥

রাত্তিরে খেতে বসার সময় বাবা রোজই জিজ্ঞেস করেন, খোকন কোথায়? বাড়ি ফিরেছে?

মা বলেন, হ্যাঁ, ও তো আজকাল সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে থাকে না। খুব পড়াশুনো করে দেখি সব সময়। পড়াশুনোয় আবার মন বসেছে মনে হচ্ছে।

বাবা জিজ্ঞেস করেন, খেয়েছে না খায় নি? না খেয়ে থাকলে আমার সঙ্গেই ওর খাবার দিয়ে দাও না।

ওর খাওয়া হয়ে গেছে কখন।

এক এক দিন মধুময় সত্যিই বাড়ি ফেরে সন্ধ্যের পর। একটা বই খুলে শুয়ে থাকে বিছানায়। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে তার ঘরে।

কিন্তু বইয়ের পাতা বেশী ওল্টানো হয় না। খানিকটা পড়তে না পড়তেই মধুময় নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়।

মা একদিন সকালবেলা বললেন, তোর বাবা বলছিলেন—

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে মধুময় জিজ্ঞেস করল, কী?

তুই এই সোমবার বোম্বে যাবি? তোর জন্য টিকিট কাটবে?

কেন, এই সোমবারই কেন?

ওঁর এক বন্ধু ফাইজার কোম্পানির মিস্টার মিত্র ·· ··উনি যাচ্ছেন সোমবার····· তা হলে ওঁর সঙ্গেই যেতে পারিস।

আবার চোখ নামিয়ে মধুময় বলল, কেন, আমি কি শিশু? ওর সঙ্গে যেতে হবে কেন? আমি একা যেতে পারি না?

তা পারবি না কেন। তবু একজন চেনা লোক সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয় ··

না।

তুই বোম্বেতে যাবি না ?

আর যেদিনই যাই, এই সোমবার যাব না। যেদিন যাব একাই যাব।

পর দিন সকালে মা আবার বললেন, আগেব দিনের চেয়েও নবম গলায়, তোর বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন ··

আবার চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে মধুময় বলল, কী ?

তুই এই সোমবাব যদি না যেতে চাস, কবে যাবি, একটা দিন ঠিক কর। শুধু শুধু দেরি করে লাভ কি ?

এখন দিন ঠিক করার একটু মুশকিল আছে। অন্তত মাস দু-এক আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

কেন ! মাস দু-এক তুই এখানে কি করবি ?

মধুময় মায়ের চোখের দিকে সোজা চেয়ে থেকে পরিষ্কার গলায় বলল, মা, এই জীবনটা আমার। এটাকে কি ভাবে খরচ করব, সেটা আমাকেই ঠিক করতে হবে। আমি যদি বখে যেতে চাই, গুণ্ডা-বদমাইশ হয়ে যেতে চাই, তোমরা আমাকে আটকাতে পারবে ? আমি একটা ব্যাপার নিযে চিন্তা করছি, আমার অন্তত দু'মাস সময় চাই। সেই দু' মাস সময় দিতে যদি তোমরা রাজি না থাক, তাহলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও রাজি আছি।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ও মা, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা আবার কোথা থেকে আসছে ? তোর কি আমাদের ওপর কোন টান নেই ?

মধুময় বলল, মা, আমার বয়েসী অনেক ছেলেই চাকরি-বাকরি, পড়াশুনো বা অন্য অনেক কারণে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকে। তা বলে তাদের টান থাকে না বাবা-মা সম্পর্কে ? আমি বেকার বলেই কি আমাকে বাধ্য হয়ে থাকতে হবে এ বাড়িতে ?

মা হঠাৎ চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

মধুময়ের যেন আবেগ, অনুভূতি কিছুই নেই। আগে এ রকম ছিল না, আগে মায়ের কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারত না সে। ছেলে-বেলা থেকে যখন যতই অবাধ্যপনা করুক, মাকে একবার কাঁদতে দেখলেই সেও কাঁদতে শুরু করত। মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে বলত, তুমি কেঁদো না মা। তুমি যা বলবে, আমি সব শুনব। কেঁদো না···

এখন মধুময় টেবিলের ওপাশে বসে থেকে চুপ করে দেখতে লাগল মায়ের কান্না। তার মধ্যেই সে শেষ করে ফেলল তার চা, টোস্ট।

মধুময় টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বলল, তুমি শুধু শুধু কাঁদছ মা। বোম্বেতে যাব না, সে কথা আমি একবারও বলি নি। আমি শুধু দু'মাস সময় চেয়েছি।

* * *

দু'দিন পর মধুময় নিজেই একটা কথা বলে দারুণ ভাবে চমকে দিল মাকে।

মা, আমার অন্নপ্রাশনের সময়ে আমি সাতটা আংটি আর কয়েকটা রূপোর থালা গেলাস পেয়েছিলাম না?

হ্যাঁ, পেয়েছিলি তো—

সেগুলো সব আছে তোমার কাছে?

হ্যাঁ, থাকবে না কেন—

চোদ্দ বছর বয়সে আমার যখন পৈতে হয় তখন আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই টাকা দিয়েছিল।

হ্যাঁ, প্রায় সাতশো টাকা, সে টাকা তোর নামে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আছে।

সেই টাকাগুলো আমার চাই, আর ঐ সোনার আংটিগুলো আর রূপোর থালা গেলাসও আমি বিক্রি করতে চাই।

মা বিস্ময়ে কোন কথা বলতে পারলেন না।

মধুময় বলল, ঐ টাকাগুলো আর ঐ জিনিসগুলো যদি আমার বলেই ভেবে থাক তোমরা, তাহলে ওগুলো ইচ্ছে মতন ব্যবহার করার অধিকার আমার থাকবে না? আমার পঁচিশ বছর বয়েস, এখনও যদি আমার জিনিস আমি ইচ্ছে মতন ব্যবহার করতে না পারি, তা হলে আর কবে করব? অথবা বলে দাও, ওগুলো আমার নয়, আমি চাইব না।

কিন্তু ওগুলো বিক্রি করবি কেন?

বোম্বে যাবার ভাড়াটা আমি ওর থেকে সরিয়ে রাখব। বাকি টাকা আমার হাত খরচ লাগবে।

হাত খরচ···আমার কাছে চাইলে কি আমি দিই না?

আমি আর চাইব না। এই দু'মাস অন্তত, আমি বাড়ি থেকে এক পয়সা নেব না, আবার চুরি ডাকাতিও করতে যাব না।

ফের ঐ সব কথা উচ্চারণ করছিস, খোকা?

মা, চুরি-ডাকাতি অনেকেই করে। কোটিপতি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মন্দিরের পুরুতরা পর্যন্ত! সে যা-ই হোক, তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না মা। আমার জন্য আর তোমাদের কক্ষনো লজ্জা পেতে হবে না।

মা বললেন, খোকা, তোর কথা শুনলে আমার আজকাল ভয় করে। তুই এত বদলে গেলি কেন রে?

ভাবলেশহীন গম্ভীর গলায় মধুময় বলল, মা, তোমার কোন ভয় নেই। কিংবা তুমি যদি ভয় পেতে চাও, তাহলে তো প্রত্যেক দিনই ভয় পাবার মতন কিছু না কিছু ঘটছে পৃথিবীতে!

এই ঘটনার পর আবার মধুময় অনিয়মিত সময়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। কখনো কখনো অনেক রাত হয়ে যায়। মা সে কথা লুকিয়ে রাখে বাবার কাছে, মধুময় বাড়ি না ফিরলেও তিনি তার ঘরের আলো জ্বেলে রাখেন।

। তিন ।

স্বপ্না তার দুজন বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল ডায়মণ্ড হারবারে। ওর এক বান্ধবীর পিসতুতো দাদা ওখানকার এস. ডি. ও। আগে থেকে খবর দিয়ে যায় নি, তাই এস. ডি. ও. সাহেব তখন ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন। সেই বান্ধবীটির নাম এষা। সে বলেছিল, আমার দাদার লঞ্চে করে তোদের কাকদ্বীপ পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

কিন্তু এষার দাদাও নেই, লঞ্চও নেই। এষার বৌদি অবশ্য ওদের খুব যত্ন-টত্ন করলেন, কিন্তু ওরা তিনজনেই গঙ্গার ওপরে লঞ্চে চড়ে বেড়াবে এই আশা করেছিল খুব।

একটা উপায় অবশ্য আছে। ডায়মণ্ড হারবার থেকে ফেরি লঞ্চ যায় ওদিকের কুঁকড়োহাটি পর্যন্ত। প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে, সেই ফেরিতে করে বেড়িয়ে আসা যায়।

অগত্যা ওরা তিনটি মেয়ে সেই ফেরিরই টিকিট কেটে চড়ে বসল। এষার বৌদি অবশ্য অনেক বারণ করেছিলেন, ওরা শুনল না। সঙ্গে পুরুষ মানুষ নেই বলে কি ওরা বেড়াতে পারবে না?

শীতের মনোরম বিকেল, গঙ্গার ওপর চমৎকার বাতাস। খুবই ভালো লাগবার কথা, কিন্তু স্বপ্না একটু গম্ভীর হয়ে গেল। এষা আর বাসবী কিন্তু খুশিতে ঝলমল করছে। ওরা জিজ্ঞেস করল, কি রে স্বপ্না, তোর হঠাৎ মুখ ভার হয়ে গেল কেন?

স্বপ্না ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলল, কই, না তো।

এদিক থেকে হলদিয়ায় প্রচুর লোক যাতায়াত করে বলে লঞ্চে বেশ ভিড়। ওরা বসবার জায়গা পায় নি, দাঁড়িয়ে ছিল রেলিং-এ ভর দিয়ে।

তিনটি সুন্দরী যুবতী—ওদের দিকে অন্যদের দৃষ্টি পড়বেই। কয়েকটি যুবক বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ল। তারা ভিড় ঠেলে ঠুলে এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

স্বপ্না জলের দিকে চেয়ে আছে। লঞ্চের ঘটঘট শব্দ, জলের ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়েও সেই ছেলেদের কথা তার কানে আসে। এরা সেই বঞ্চিত যুবকের দল, যারা কোন মেয়েকে বান্ধবী হিসেবে পায় নি বলে যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যই অন্য মেয়েদের দেখলে অপমান করার চেষ্টা করে। ওরা বুঝে গেছে, স্বপ্নাদের সঙ্গে কোন পুরুষ দেহরক্ষী নেই। তাই ওরা অশ্লীল কথাব বন্যা বইয়ে দিতে লাগল। বিশেষত ওদের মধ্যে চশমা পরা লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার একটি ছেলে এত সব কুৎসিত কথা বলতে লাগল যে, সে সব কথা কেউ কখনও যে মুখে উচ্চারণ করতে পারে, স্বপ্না তা কল্পনাও করে নি।

স্বপ্না কোন খারাপ কথা সহ্য করতে পারে না, তার গায়ে যেন বিষাক্ত তীর ফুটতে লাগল। এষা আর বাসবী দু-একবার তাকাল কটমট করে সেই ছেলেগুলোর দিকে। তাতে যেন আরও বেড়ে গেল তাদের উৎসাহ।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল লঞ্চের ছাদে। স্বপ্না বলল, চল, নীচে যাই। নীচে যাবার একটু পরেই সেখানেও হাজির হল ছেলেগুলো। আবার সেখানেও শুরু হল কুৎসিত কথার ফোয়ারা। অন্য কেউ ওদের বাধাও দিচ্ছে না। একসঙ্গে চার পাঁচটি ছেলে যে-কোন অসভ্যতা করলেও অন্য কেউ বাধা দেবার সাহস পায় না।

খেয়া লঞ্চের যাত্রী নানা রকম হয়। কেউ কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। অনেকে লঞ্চে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েকজন বিস্মিত ভাবে যুবকদের দিকে চেয়ে রইল, কেউ কেউ দুঃখিত হল, কিন্তু একটি প্রতিবাদের বাক্যও উচ্চারণ করল না কেউ। স্বপ্না দু'হাতে কান চাপা দিয়ে রইল। সে ভাবতে লাগল কখন এই যাত্রাটা ফুরোবে।

গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। দু'পাশের উত্তাল ঢেউয়ের দিকে তাকালে মুগ্ধ হওয়া যায়।, কিন্তু স্বপ্নার আর সেদিকে মন নেই। সে চোখ বুজে

আছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটকে মনে হল পাঁচ ঘণ্টা, তারপর লঞ্চ এসে পৌঁছল কুঁকড়োহাটিতে। মেয়ে তিনটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ভাটার সময় বলে লঞ্চটা ঠিক মতন জেটিতে ভিড়তে পারল না। একটা লম্বা তক্তা ফেলে দেওয়া হল। সেটার ওপর দিয়ে নামতে হবে খুব সাবধানে।

নামবার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। একজন হঠাৎ ঝপাস করে পড়ে গেল নীচে। বহু লোক হৈ হৈ করে উঠল একসঙ্গে। সেখানে অবশ্য জল বেশী নেই, থকথকে কাদা। সেই কাদায় মাখামাখি হয়ে লোকটি যখন উঠে দাঁড়াল, তখন স্বপ্নারা দেখল, এই সেই চশমা পরা লম্বা সিড়িঙ্গে ছেলেটা। সে ছিল প্রায় স্বপ্নাদের পিছনেই। তখনও খারাপ কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা তিনজন প্রথমটায় শিউরে উঠেছিল ভয়ে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে বাসবী আর এষা কুল-কুল করে হাসতে লাগল।

এষা বলল, বেশ হয়েছে! ঠিক শাস্তি হয়েছে! অসভ্য কোথাকার!

বাসবী বলল, আমার ইচ্ছে করছিল, লোকটাকে ঠেলে ফেলে দিতে!

স্বপ্নার মুখখানা আরও ম্লান হয়ে গেছে। সে একটুও খুশি হয় নি। সে মৃদু স্বরে বলল, যদি লোকটা মরে যেত? হঠাৎ পড়ে গেলে, অনেক সময়—

স্বপ্না অন্ধকারে চকিতে পিছনে একবার তাকিয়েই ঘুরিয়ে নিল মুখ। কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা তখনও চিৎকার করে কাকে যেন গালাগালি দিচ্ছে।

ফেরার লঞ্চ এক ঘণ্টা পরেই ছাড়বার কথা। কিন্তু কী একটা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেটা ছাড়ল তিন ঘণ্টা বাদে। বাসবী আর এষার ইচ্ছে ছিল হলদিয়া থেকে ঘুরে আসার। এখান থেকে খুব সহজেই বাসে হলদিয়া ঘুরে আসা যায়। তিন ঘণ্টা সময় তো হাতে আছেই। কিন্তু স্বপ্না রাজি হল না। সে আর বেশী দূর যেতে

চায় না। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ওরা তিনজন লঞ্চে এসেই বসে ছিল।

এষা জিজ্ঞেস করল, কি রে স্বপ্না, তুই এখনও মুখ গোমড়া করে আছিস কেন?

স্বপ্না বলল, কী জানি, আমার মনে হচ্ছে, না এলেই বোধ হয় ভালো হত!

বাসবী বলল, ফেরার সময় নিশ্চয়ই ঐ ছেলেগুলো আর আসবে না। সত্যি, বড্ড জ্বালাতন করছিল। ছেলেগুলো কী ভাবে বলত? ও রকম খারাপ কথা বললে কোন দিনই তো কোন মেয়ে ওদের পছন্দ করবে না।

এষা বলল, আলাপ করার সৎ সাহস নেই। আমাদের সঙ্গে ভদ্র ভাবে আলাপ করতে এলে কি আমরা কথা বলতুম না?

ফেরার সময় কোন ঝঞ্ঝাট হল না। চমৎকার জ্যোৎস্নায় নদী সফর খুব সুন্দরই হল। কিন্তু ফেরার পর ওরা আবিষ্কার করল যে লাস্ট ট্রেন ছাড়া ওদেব কলকাতায় ফেরার আর কোন উপায় নেই। লাস্ট ট্রেনে গেলে ওদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় বারোটা বেজে যাবে।

এষার দাদা ট্যুর থেকে ফেরেন নি। সেদিনও ফিরবেন না খবর পাঠিয়েছেন। বৌদি বললেন, রাত্তিরে ডায়মণ্ড হারবারেই থেকে যেতে। লাস্ট ট্রেনে ফেরা ওদের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রায় সব কামরাই ফাঁকা থাকে। হঠাৎ হঠাৎ ডাকাতির উপদ্রব হয়। মেয়েরা কেউই প্রায় ঐ ট্রেনে যায় না।

কিন্তু স্বপ্নাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। সে কিছু বলে আসে নি। না জানিয়ে বাড়ির বাইরে সারা রাত থাকা স্বপ্না চিন্তাও করতে পারে না। মা বাবা দারুণ ব্যস্ত হয়ে থানায় হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। অথবা মাঝরাত্তিরে গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবেন ডায়মণ্ড হারবারে।

এষার বৌদি বললেন, ফোনে খবর দিয়ে দিতে।

ফোনে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করা হল। কিন্তু টেলিফোন দেবতার সেদিন মেজাজ খারাপ। কিছুতেই লাইন পাওয়া গেল না। এদিকে লাস্ট ট্রেন ছেড়ে যাবারও সময় হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্না উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে যেতেই হবে। তোরা থেকে যা বরং, আমি তোদের বাড়িতে খবর দিয়ে দেব।

স্বপ্নাকে একা যেতে দেওয়া যায় না। এষা আর বাসবী বলল, না, আমরাও যাব। ট্রেনে যদি ডাকাত আসে।মেরে তো ফেলবে না··· দেখাই যাক না, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

স্বপ্না ওদের বার বার বলল যে সে একা ঠিকই চলে যেতে পারবে। তার জন্য ওদের ভ্রমণ নষ্ট করার কোন মানে হয় না। কিন্তু স্বপ্নার দুই বান্ধবী অবশ্য তাতে রাজি হতে পারে না। এত রাত্রে স্বপ্না একা ট্রেনে যাবে, এটা কখনো সম্ভব!

এবার বৌদি ওদের সঙ্গে তাঁর স্বামীর অফিসের একজন আর্দালিকে পাঠাতে চাইলেন। তাতে আপত্তি করল তিনজনেই। ওরা তেমন অবলা নয় যে পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ঘোরা ফেরা করতে পারবে না।

ওরা বেছে বেছে উঠল একটা ভিড়ের কামরায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ছেড়ে দিল। কিন্তু দু-তিন স্টেশনের মধ্যেই নেমে গেল অনেকে। বেঞ্চগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। ওদের ভয় করতে লাগল একটু একটু।

মাঝে মাঝে গাড়ির গতি এমনি এমনিই আস্তে হয়ে আসে। হঠাৎ দু-তিন মিনিটের জন্যে নিভে যায় আলো। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে উঠে আসবে ডাকাতের দল।

কিন্তু ডাকাতির বদলে শুরু হল সেই পুরোনো উৎপাত।

উল্টোদিকের বেঞ্চ থেকে একটা লোক উঠে এসে ওদের ঠিক পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় যাবেন?

লোকটার চোখ দুটো লাল। কথা জড়ানো। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে বেরুচ্ছে বিশ্রী গন্ধ।

স্বপ্নার যেমন অশ্লীল কথায় আপত্তি, এষার তেমনি আবার মাতালের ভয়। তার কাছে ভূত আর মাতাল প্রায় সমান। এষা শিউরে উঠে সরে গেল।

লোকটি বলল, ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি থাকতে কোন শালা এখানে আপনাদের ভয় দেখাতে আসবে না। আপনারা কোথায় যাবেন বলুন না? আমি আছি, বডি গার্ড।

লোকটি পকেট থেকে একটা বাংলা মদের বোতল বার করে দিল একটা লম্বা চুমুক। অন্য বেঞ্চ থেকে একজন বলল, আমায় একটু দে। সবটা একাই মেরে দিস না শালা!

মেয়ে তিনটি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল গায়ে গা ঘেঁষে। বোঝা গেল এই মাতালটি একা নয়, তার দলে আরও লোক আছে। কামরার সবাই এক দলের কিনা, তাই বা কে জানে!

বাসবী একটু সাহস করে লোকটিকে বলল, আপনি একটু সরে বসুন না। আরও তো অনেক জায়গা রয়েছে!

লোকটি বলল, কেন ভাই? যার যেখানে খুশি বসবে। রেলের সম্পত্তি কারুর কেনা নয়। এখানে সীট রিজার্ভ করাও নেই।

অন্য দিকের লোকগুলো হেসে উঠল বিশ্রীভাবে।

এই সব লোকের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই বুঝে মেয়ে তিনটি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

কিন্তু মাতালরা নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারে না। লোকটি ওদের দিকে ঝুঁকে বলল, হ্যাঁ ভাই, আপনারা বুঝি ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে এসেছিলেন?

ওরা কেউ উত্তর দিল না।

লোকটি আবার জড়ানো গলায় বলল, আমার নাম জগা। আমি থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই। আমায় এ লাইনে সবাই চেনে। আপনারা কোথায় যাবেন বললেন না তো!

হঠাৎ এই সময়ে আর একবার আলো নিভে যেতেই এষা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

আলো আবার জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

বাসবী জিজ্ঞেস করল, কি? কি হয়েছিল রে?

এষা বলল, ঐ লোকটা আমার হাত ধরবার চেষ্টা করছিল।

লোকটার মুখে মিটিমিটি হাসি। নেশায় মাথাটা ঝুঁকে পড়ছে বুকের ওপর। সে বলল, হাত ধরব কেন ভাই? আমি পকেটে হাত দিয়ে বিড়ি বার করতে যাচ্ছিলাম·· অন্ধকারের মধ্যে নিজের পকেট না অন্যের পকেট—

কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে একটি লোক চাদর মুড়ি দিয়ে, এই শীতের মধ্যেও জানালা খুলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে ছিল বাইরে। এবার লোকটি চাদর খুলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওদের কাছে এগিয়ে এলো। দীর্ঘকায় পুরুষ মধুময়।

বাসবী বা এষাকে যেন সে দেখতেই পেল না। স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সে বেশ শান্ত গলায় বলল, 'আপনারা ঐ দিকটায় গিয়ে বসুন, ফাঁকা আছে। আমি এখানে বসছি।

এষা এই লোকটিকেও অবিশ্বাস করে বলল, কেন আমরা উঠতে যাব? আমরা আগে এখানে এসে বসেছি, ঐ লোকটাই ওদিকে চলে যাক না।

মধুময় বলল, সে রকম ভাবে বলে কোন লাভ নেই। আপনারা আমার জায়গায় গিয়ে বসুন, আমি এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছি।

এষা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, এই লোকটা অত্যন্ত অসভ্য। আমি চেন টানব।

মধুময় বলল, তাকিয়ে দেখুন, এদিককার লোকাল ট্রেনে চেন নেই। সে সব কবেই লোকে ছিঁড়ে-টিড়ে ফেলেছে।

এষা বলল, পরের স্টেশনে আমি পুলিশ ডাকব।

মধুময় বলল, এত রাত্রে কি আর স্টেশনে পুলিশ থাকবে? সন্দেহ আছে।

তারপর সে একটু হেসে বলল, আপনারা বিশ্বাস করুন, আমিই পুলিস, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

এষা তবু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি পুলিশ ?

মধুময় কামরার চতুর্দিকে প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি পুলিশ। এরা সব সাধারণ হাটুরে লোক, এদের ভয় পাবার কিছু নেই।

স্বপ্না চোখ নামিয়েই ছিল। এবার একটুখানি তুলে বলল, ইয়ে··· আপনি এদিকে কেন এসেছিলেন ?

মধুময় বলল, এই একটু বেড়াবার জন্য এসেছিলাম। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে এখানে, আপনারা বরং ঐ দিকে গিয়ে বসুন, আমি এখানে বসছি।

এষা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে স্বপ্নার হাত ধরে টানল। স্বপ্না আর কোন কথা বলল না। ওরা তিনজনে চলে গেল কামরার অন্য দিকে।

স্বপ্নাদের পরিত্যক্ত জায়গায় মধুময় বেশ শব্দ করে বসল, তারপর মাতালটিকে বলল, আমি এখন ঘুমোব, সোনারপুর এসে গেলে আমাকে একটু ডেকে দিতে পারবেন দাদা ?

মধুময়ের চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যে জন্য চট করে সাধারণ মস্তানরা তাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

বাসবী ফিসফিস করে স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ভদ্রলোককে চিনিস ?

স্বপ্না জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। যেন শুনতেই পাচ্ছে না। বাসবী দু'তিনবার জিজ্ঞেস করার পর সে বলল, হ্যাঁ চিনি—মানে আমরা আগে যে পাড়ায় থাকতাম, সেখানে থাকেন।

এষা বলল, লঞ্চে যাবার সময়ও ঐ ভদ্রলোককে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। তুই তখন দেখিস নি ?

স্বপ্না কোন উত্তর দিল না।

বাসবী বলল, বেশ হ্যাণ্ডসাম চেহারা।

এষা বলল, ভদ্দরলোক বললেন উনি পুলিশ, সত্যি তাই ? দেখে কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

স্বপ্না এবারও কোন উত্তর দিল না।

বাসবী বলল, ঐ রকম উপকারী পুলিশ আজকাল সহজে দেখাই যায় না।

এষা বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গে ওরা আবার কোন গোলমাল বাধাবে না তো!

মধুময় কিন্তু ঘুমের ভান করে চোখ বুজে আছে মাথা হেলান দিয়ে। মাতালটি চুপ মেরে গেছে।

* * *

স্বপ্নারা নামল বালিগঞ্জ স্টেশনে। অনেক রাত হয়ে গেছে। ওরা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

এত রাতে ট্যাক্সি পাওয়া বেশ শক্ত। দু-তিনটে ট্যাক্সি রয়েছে, কিন্তু কোন অনির্দিষ্ট কারণে ওদের নিতে চায় না। তারপর একটা ট্যাক্সি রাজি হল কোন রকমে।

দরজা খুলে ট্যাক্সিতে ওঠার মুহূর্তে স্বপ্না একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পিছনে।

একটা দোকানের পাশে মধুময় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় স্বপ্নারা ট্যাক্সি না পাওয়া পর্যন্ত সে ওখান থেকে নড়ত না।

স্বপ্নার মুখখানা তবু কঠিন হয়ে রইল। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর বাসবী বলল, ভাগ্যিস ঐ ভদ্দরলোক ছিলেন···নইলে আজ কি যে হত···

এষা বলল, মাতালটা আমার হাত ধরার চেষ্টা করছিল, ইস্, ভাবলেই গা ঘিন ঘিন করে···।

স্বপ্না যোগ দিল না ওদের কথাবার্তায়।

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর মধুময় সিগারেট কেনবার জন্য দাঁড়াল আর একটা দোকানের সামনে। এতক্ষণ তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু

টান টান হয়ে ছিল। যে কোন মুহূর্তে সে লাফিয়ে পড়ে ঘায়েল করে দিতে পারত সাত আটজন লোককে। এমন কি শেষ ট্যাক্সিওয়ালাটিও যদি রাজি না হত, তাহলে মধুময় গিয়ে চেপে ধরত ওর টুঁটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রকম কিছু ঘটে নি। তবু ভেতরে ভেতরে সে উত্তেজনা বোধ করছে এখনো। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্বপ্না তাকে 'আপনি' বলেছে। লঞ্চে যাবাব সময় স্বপ্না তাকে দেখতে পেয়েও একটা কথা বলে নি।

স্বপ্না বলেছিল, তুমি আর আমাদের বাড়িতে কখনো এসো না। মধুময় তো স্বপ্নাদের বাড়িতে যায় নি। কিন্তু পথে বা নদীর বুকেও কি স্বপ্নার সঙ্গে তার দেখা করা নিষেধ? সেটা ভালো করে জেনে নিতে হবে।

। চার ।

রতনের দেড় বছর জেল হলেও আইনের নানান্ ফাঁকে ধনা ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। ধনার ভালো নাম ধনঞ্জয়। তার বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। দু-তিন মাস ধরে ভবিষ্যৎ চিন্তা করার মতো বিলাসিতা সে করতে পারে না।

তাকে দু' বেলা খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করতেই হবে। শুধু তার নিজের জন্য নয়, পরিবারের সকলের জন্য। ধনার ছোট ভাইটি পড়াশুনোয় খুব ভালো। ধনা নিজে লেখাপড়া শিখতে পারে নি, তাই ছোট ভাইটিকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য তার খুব আগ্রহ।

বে-আইনী টাকা জমিয়ে রাখা যায় না। ধনা আগে যা রোজগার করেছিল, তা কিছুই নেই। ধনার মা আবার তার শেষ গয়নাটি পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে ধনার জন্য উকিল ঠিক করেছিলেন।

জেল থেকে বেরিয়েই ধনা একটা গেঞ্জির কারখানায় কাজ যোগাড় করে ফেলল। কারখানার শ্রমিক নয় অবশ্য, খানিকটা কেরানিগিরি আর খানিকটা মালিকের ফাই-ফরমাস খাটা। মাইনে খুবই সামান্য।

ধনা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল কোন রকমে। ছেলেবেলা থেকেই ব্যায়াম করে তার চেহারা খুব তাগড়া, সে অসম্ভব রকম খেতে ভালোবাসে, সামান্য একটু তরকারি দিয়ে সে পনেরো কুড়িখানা রুটি খেয়ে ফেলতে পারে অনায়াসে।

ধনা মাইনে পায় দু'শো চল্লিশ টাকা। ওদের পরিবারে পাঁচ জন লোক। সুতরাং প্রত্যেক দিন পনেরো কুড়িখানা রুটি ধনার ভাগ্যে জোটার কথা নয়।

*　　*　　*

এক শনিবার বিকেলে পার্ক সার্কাস মাঠের কাছে ধনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মধুময়ের। মধুময় তার পুরোনো সঙ্গীদের সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছিল। ধনাকে দেখেও তাই মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল অন্য দিকে, কিন্তু ধনাই এসে ধরল তাকে।

কী রে মধু, চিনতেই পারছিস না যে!

মধুময় লজ্জা পেয়ে গেল। এরা তো কেউ তাকে জোর করে খারাপ পথে নিয়ে যায় নি। সে-ই গিয়েছিল স্বেচ্ছায়। সুতরাং এদের তো দোষ দেওয়া উচিত নয়। মধুময় বলল, না রে, দেখতে পাই নি তোকে। কেমন আছিস?

ধনা বলল, আর আছি! রোজ দু'বেলা জুতো খাচ্ছি। একটা চাকরি জুটিয়েছি ভাই কোন রকমে, কিন্তু মালিক যখন তখন শোনায়, দাগী আসামী, তোমায় চাকরি দিয়েছি এই ঢের!

মধুময় এখনও কোন কাজ-টাজ করে না শুনে ধনা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, তাহলে তুই কী করবি ঠিক করেছিস? কিছু ভাবিস নি!

মধুময় দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

ধনা বলল, আমারও ইচ্ছে করছে, এ শালার চাকরিতে লাথি মেরে বেরিয়ে আসি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে মাসে মাইনে দেবে মাত্র দু'শো চল্লিশ টাকা! আর মালিক দিন দিন মোটা হবে!

মধুময় সত্যি দুঃখ বোধ করল ধনার জন্য। ছেলেটা খুব খেতে ভালোবাসে এত কম টাকায় ওর চলবে কি করে।

ধনা বলল, আয়, একটু বসি। দু-চারটে কথা বলি।

মধুময়ের ইচ্ছে নেই, তবু আপত্তি করতে পারল না। ওরা গিয়ে মাঠের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় বসল। কাছাকাছি কোন লোকজন নেই।

প্রথমে কিছুক্ষণ পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের কথা হল। রতন নাকি ইতিমধ্যে জেল থেকে একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল, ধরাও পড়ে যায়। সে জন্য রতনের মেয়াদ বেড়ে গেছে আরও।

বেচারা রতন! তাকে কখনো ঠিক ঝানু অপরাধী বলে মনে হয় নি মধুময়ের। এই সমাজের ওপরে রতনের একটা তীব্র রাগ আছে, সে রাজনীতি ঠিক বোঝে না, কোন রাজনীতি দলে গিয়ে ভেড়েও নি, সে একা একাই কিংবা কয়েকজন মিলে এই সমাজকে ভেঙে চুরে দিতে চায়। এ জন্য লোকে তাকে অসামাজিক বলবে ঠিকই। মধুময় এখন বুঝেছে যে এ ধরনের কাজ অসামাজিকতাই, যুক্তি দিয়ে এর কোন সমর্থন করা যায় না।

ধনার সঙ্গে পার্কে বসে থাকতেও তার একটু লজ্জা লজ্জা করছে। কেউ দেখলে ভাববে, সে বুঝি আবার পুরোনো দলে ভিড়তে চাইছে।

ধনা বলল, এই চাকরি আমার পোষাবে না। এটা আমার ছাড়তেই হবে। আমি অন্য একটা কাজের কথা ভাবছি, তুই যদি সঙ্গে আসতে রাজি থাকিস—

মধুময় জিজ্ঞেস করল, কী কাজ?

ছাখ, ডাকাতি-ফাকাতি আমাদের পোষাবে না। ও সব কাজে অনেক হ্যাপা। ওর জন্য আলাদা ট্রেনিং লাগে। তা ছাড়া বেশী লোক নিয়ে কাজ হয় না। দুজনই যথেষ্ট। তুই রাজি থাকলে লেগে পড়তে পারি।

কী কাজ?

তুই তো গাড়ি চালাতে পারিস?

তা শিখেছিলাম এক সময়

ওতেই হবে। আয় তাহলে তোতে আমাতে মিলে একটা দোকান খুলি।

মধুময় হেসে ফেলল।—গাড়ি চালাবার সঙ্গে দোকান খোলার কী সম্পর্ক?

ধনা বলল, বড় ব্যবসা করবার জন্য আমাদের ক্যাপিটাল কেউ দেবে না। ব্যাঙ্কে ধার নিতে গেলে সিকিউরিটি চাইবে কিংবা বলবে টুয়েন্টি পার্সেন্ট টাকা নিজেরা ইনভেস্ট কর—সেই জন্যই বলছি, আমরা ছোটখাটো একটা দোকান খুলতে পারি অন্তত।

মধুময় খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। ছোটখাটো দোকানের দোকানদার হওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

ধনা তাব মনের ভাব বুঝেই বলল, আরে তা বলে কি আমি তেলেভাজার দোকান কিংবা গেঞ্জির দোকান খুলতে বলছি তোকে। তুই ভালো ফ্যামেলিব ছেলে, তোব প্রেষ্টিজে লাগবে। কিন্তু ধর, যদি একটা ওষুধের দোকান খোলা যায? কত বড বড় লোক ওষুধের দোকান চালায়।

কিন্তু তাতে তো অনেক টাকা লাগে।

সেই টাকাব ব্যবস্থা করতে হবে। তারও উপায় আছে।

অন্তত কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকার কমে কি ওষুধের দোকান হয়?

ঠিক তাই। আমিও ঐ বকম হিসেব ধরেছি। টাকাটা কি ভাবে জোগাড হবে শোন। আমাব সঙ্গে একটা লোকেব আলাপ হয়েছে, তার মল্লিকবাজারে ব্যবসা আছে। সে বলেছে, মোটামুটি ভালো কণ্ডিশানের গাড়ি যদি ওকে এনে ডেলিভারি দিতে পারি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ চাব হাজার টাকা দেবে।

গাড়ি? কি গাড়ি?

এই ফিয়াট, অ্যাম্বাসাডার। ফিয়াটের রেট একটু বেশি, পাঁচ হাজার।

ও সব গাড়ি আমরা পাব কোথায়?

ধনা হাত তুলে বলল, এই যে রাস্তাঘাট দিয়ে এত গাড়ি যাচ্ছে। এর থেকে দু-একখানা আমরা তুলে নিতে পারব না?

মধুময় ঠিক বুঝতে পারল না। ভুরু কুঁচকে ধনার দিকে তাকিয়ে রইল।

শোন, আমি সব প্ল্যান ছকে রেখেছি। আর কারুকে বলি নি, তোকেই বলছি। কেষ্ট, গণেশ ওরাও আমাকে বলছিল একটা কিছু কাজে নেমে পড়তে। কিন্তু ওদের আমি রিলাই করি না। তোর সঙ্গে আমার পটবে ভালো। এটা জেনে রাখিস আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কখনো নেমকহারামী করি না।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করব কি করে?

আমরা গাড়ি কিনতেও যাব না, বেচতেও যাব না। আমাদের কাজ শুধু এক জায়গা থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া। বাকি কাজ সেই মল্লিকবাজারের লোকটাই করবে। আমরা এক একটা গাড়ির জন্য চার পাঁচ হাজার করে টাকা পাব।

তার মানে গাড়ি চুরি করব?

তুই একে চুরি বলছিস কেন? চুরি কথাটা শুনতে খুব খারাপ। এটা হচ্ছে ডেলিভারি কেস। এক জায়গার গাড়ি আমরা অন্য জায়গায় ডেলিভারি দেব। কার গাড়ি, কিসের গাড়ি, সে সব তো আমাদেব জানবার দরকার নেই। সে সব বুঝবে মল্লিকবাজারেব সেই লোকটা।

মধুময় হেসে বলল, ধুৎ! তুই একটা পাগল নাকি!

ধনা বলল, বুঝতে পারলি না? ধর যদি আমরা পাঁচ ছ'খানা গাড়ি ডেলিভারি দিতে পারি—

মধুময় বলল, ডেলিভারি মানে কি? অন্য লোকের গাড়ি সরিয়ে মল্লিকবাজারে পাচার করে টাকা নেওয়া চুরি নয়?

এটাই সবচেয়ে সহজ কাজ। অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চাবি প্রায় সব এক। আর না হলেও তিন চার রকমের চাবি জোগাড় করা এমন শক্ত কিছুই না। রাত্তির বেলা নাইট শো সিনেমায় কিংবা অনেক মদের দোকানের সামনে যে সব গাড়ি থাকে, তার থেকে একখানা সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে? আমি ঘাঁত ঘোঁত সব জেনে নেব, তুই শুধু গাড়িখানা চালিয়ে সরে পড়বি।

মধুময় বিস্মিত ভাবে ধনার দিকে তাকিয়ে রইল।

কি—রাজি?

তুই কেন গাড়ি চালানো শিখে নিচ্ছিস না? তা হলে তুই নিজেই তো—

এ সব কাজ ঠিক একা একা করা যায় না। অন্তত পক্ষে দুজন চাই। একজনকে নজর রাখতে হবে···ছাখ,·আমরা যদি কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা ক্যাপিটেল·তুলতে পারি, তাহলেই আমরা একটা ওষুধের দোকান খুলে ফেলতে পারব। তাহলে বাড়ির লোকও কিছু সন্দেহ করবে না।

বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞেস করবে না, দোকান খোলার টাকা কোথা থেকে পেলাম?

তুই বলবি, আমি দিয়েছি ক্যাপিটাল। আমি বলব, তুই দিয়েছিস! সেই দোকান থেকে যদি প্রফিট হয় তো ভালোই, তাহলে আমরা অন্য লাইন একদম ছেড়ে দেব। আর যদি প্রফিট না হয় তাহলে দোকানটা চালু রেখে আমরা একখানা দুখানা করে গাড়ি সরাব। একটা কিছু ব্যবসা বা ঠিক জায়গায় চাকরি যোগাড় করে নিতে পারলে, তারপর তুই তলায় তলায় চুরি কর ডাকাতি কর, কেউ কিছু বলবে না। যত দোষ শালা শুধু বেকারদের। এদিকে অন্যরা যে চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে·····কি, রাজি?

মধুময় অনেকক্ষণ চুপ করে চিন্তা করল। একবার ভাবল, পুরো প্রস্তাবটাই হেসে উড়িয়ে দেয়। ধনা তার মুখের দিকে ব্যাগ্র ভাবে চেয়ে আছে।

যদি আবার ধরা পড়ি?

কলকাতায় গাড়ি চুরি করতে গিয়ে·কেউ কখনো ধরা পড়েছে, তুই শুনেছিস? কোন রেকর্ড নেই। ছিঁচকে চোরেরা গাড়ির পার্টস-টার্টস চুরি করতে গিয়ে অনেক সময় ধরা পড়ে। আমরা ও সবের মধ্যে নেই। আমরা দারুণ সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে যাব। আর তোর এ, রকম সুন্দর চেহারা। তোকে কে সন্দেহ করবে? ধর বাই চান্স কেউ দেখে ফেলল, তাতেই বা কি, তুই বলবি, ভুল হয়ে গেছে। অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে এ রকম ভুল প্রায়ই হয়। কি—হয় না?

মধুময় বলল, তা হয়!

তা হলে? আমাদের একটু বেশী টাকা হলে আমরা নিজেরাই একটা গাড়ি কিনে পাশে রেখে দেব। কেউ যদি আমাদের ধরতে আসে, আমরা ফাঁটের ওপর বলব, আরে মশাই ভুল হয়ে গেছে, এই তো পাশেই আমাদের গাড়ি! কি বল, প্ল্যানটা খারাপ? তুই রাজি থাকিস তো—

মধুময় হাসতে হাসতে বলল, এত সহজ?

ধনা বলল, হ্যাঁ রে, সত্যি সহজ। একবার ট্রাই করেই দেখা যাক না। যে ভদ্দরলোক গাড়ি ডেলিভারি নেয়, তার আরও ক্লায়েন্ট আছে। প্রায়ই তারা গাড়ি ডেলিভারি দেয়। এ পর্যন্ত কেউ ধরা পড়ে নি।

আচ্ছা, ভেবে দেখি!

এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে? আমাদের তো একটা কিছু করে দাঁড়াতে হবে। কলকাতা শহরে যারা গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের একটা গাড়ি হারিয়ে গেলেও আর একটা গাড়ি কিনে ফেলতে পারে অনায়াসে। আমরা বেশি লোভ করব না, মাসে দুখানার বেশী গাড়ি ডেলিভারি দেব না। আর যদি দোকানটা ভালো ভাবে চলে, আমরা পুরোপুরি ভদ্দরলোক হয়ে যাব। তোকে দোকানের জন্য বেশী খাটতে হবে না, সব আমি ম্যানেজ করব।

ঠিক আছে, ভেবে দেখি ব্যাপারটা।

শোন মধু, তোকে একটা কথা বলব? দেরি করে লাভ কি? শুভস্য শীঘ্রম্ বলে একটা কথা আছে না? আজ শনিবার, আকাশটা মেঘলা মেঘলা, বৃষ্টি নামতে পারে, আজই আইডিয়াল দিন···আজই কাজ শুরু করা যাক না? একটা গাড়ি ডেলিভারি দিতে পারলেই তোর দু-হাজার আমার দু-হাজার।

আজ পারব না আমি।

কেন? তোর আজ বিশেষ কিছু কাজ আছে?

সে জন্য নয়। আমি ঠিক এক মাস তেইশ দিন সময় চাই।

এক মাস তেইশ দিন? তার মানে?

এই সময়টা আমি একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে চিন্তা করছি। এই ক'টা দিন কেটে গেলে তারপর আমি ঠিক করব, তোর সঙ্গে এই কাজে নামব কিনা। আমি না নামলেও তুই অন্য লোক পেয়ে যাবি।

যা বাবাঃ! তুই কি ব্রত-ট্রত নিয়েছিস নাকি? এক মাস তেইশ দিন ধরে চিন্তা? এ রকম শুনি নি কক্ষনো!

মধুময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, ব্রতই বলতে পারিস। তার আগে আমার অন্য কিছু করার উপায় নেই। এ লাইনে যদি আবার ফিরে আসি, তাহলে তোর প্ল্যানটা খুবই ভালো সন্দেহ নেই। তোর সঙ্গেই নেমে পড়ব।

ধনা সেখানেই বসে রইল অবাক হয়ে। মধুময় হন হন করে হেঁটে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল।

।। পাঁচ ।।

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে রাসবিহারীর মোড়। শুধু এই জায়গাটুকুতে মধুময় জীবনে আর কখনো যাবে না। এ ছাড়া কলকাতার বাকি অংশ বা কলকাতার বাইরে, কিংবা গোটা ভারতবর্ষ, সব জায়গাতেই মধুময়ের যাওয়ার অধিকার আছে। সে স্বাধীন, পুলিশও তার নামে কোন অভিযোগ প্রমাণিত করতে পারে নি।

মধুময় এখন প্রায় কোন সময়েই বাড়িতে থাকে না। মা কোন অভিযোগ করতে পারেন না। কারণ মধুময় মাকে খুব স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে যে তাকে দু'মাস সময় দিতে হবে।

পায়জামা, পাঞ্জাবী পরা। আর একটা কালো রঙের শাল জড়ানো গায়, মধুময় যেন একজন সন্ন্যাসী, সে শহরের পথে পথে একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। সামান্য চেনাশুনো কাউকে দেখলেই সে সরে যায় চট করে। কারুর সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সন্ন্যাসীরা সব সময় ভগবানের কথা চিন্তা করে কিনা কে জানে, কিন্তু মধুময়ের বুকের মধ্যে সব সময় একটিই ছবি, স্বপ্নার মুখ।

এজন্য এক এক সময় নিজের ওপরেই খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে মধুময়। পৃথিবীতে স্বপ্না ছাড়া কি আর কিছু নেই? সে কি অন্য কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না? ধরা যাক স্বপ্না মরে গেছে। জেল থেকে বেরিয়ে মধুময় যদি শুনত যে হঠাৎ একটা অসুখে স্বপ্না মারা গেছে ইতিমধ্যে, তা হলে মধুময় কী করত। সে কি পাগল হয়ে যেত? কিংবা আত্মহত্যা করত? কত রকম কঠিন শোক সহ্য করেও তো

মানুষ বেঁচে থাকে। ছেলের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে মা, এর চেয়ে বড় শোক তো আর নেই।

চাকরি ছাড়াও কি একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না? মধুময়ের গায়ে জোর আছে, শুধু শারীরিক শক্তি দিয়েও এখনও একজন মানুষ এই শহরে নিজের বেঁচে থাকার মতন টাকা রোজগাব করতে পারে।

রেল স্টেশনে কুলিরা কি বেঁচে নেই? সেই সব কুলিরাও কখনো কখনো হাসে, তারাও গান গায়, অর্থাৎ তাদের জীবনেও কিছু না কিছু সুখ আছে। কত বেকার ছেলে তো ফুটপাথে বসে ফ্রক কিংবা গেঞ্জি বিক্রি করে, মধুময় তাও পারে। সে পারে ট্রেনে ট্রেনে আশ্চর্য মলম কিংবা ডট পেন ফিরি করতে। এ সব ব্যাপারে মধুময়ের কোন লজ্জা নেই।

কিন্তু এগুলো করতে গেলে মধুময়কে একা হয়ে যেতে হবে। একা হলে সে যে ভাবেই হোক নিজের জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সে একা নয়। তার দু'দিকে বাধা আছে।

বাবা রিটায়ার করবেন শিগগিরই, সবাই আশা করে আছে, তারপর মধুময়ই সংসারের দায়িত্ব নেবে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এ রকমই নিয়ম।

সে এক ছেলে, তার দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, ছোট বোন কলেজে পড়ে। এ রকম সংসারে ছেলেটিকেই ঘাড় পেতে সংসারের দায়িত্ব নেবার জন্য তৈরি হতে হয়। সেই জন্যই তাকে শেখানো হয়েছে লেখা পড়া। সেই লেখা পড়া শেখার বিনিময়ে সরকার তাকে চাকরি দিতে অক্ষম, সেটাও কি মধুময়ের দোষ?

মধুময় স্টেশনের কুলি কিংবা ট্রেনের ফেরিওয়ালা হয়ে টাকা রোজগার করে সংসার চালাতে চাইলেও কেউ তা মেনে নেবে না। কারণ তারা ভদ্রলোক। ভদ্দরলোকদের ওসব করতে নেই। সে স্টেশনের কুলি কিংবা ট্রেনের ফেরিওয়ালা হলে তার ছোট বোনের ভালো জায়গায় বিয়ে হবে না পর্যন্ত! মা কেঁদে ভাসাবেন। মা তাঁর

বড়লোক ভাইদের কাছে কাকুতি মিনতি করবেন মধুময়ের যে কোন একটা ভদ্রলোকের চাকরি জোগাড় করে দেবার জন্য।

কারুকে ঘুষ দিয়ে চাকরি জোগাড় করতেও মা-বাবাদের কোন আপত্তি নেই। মধুময় গুণ্ডামি ডাকাতি করে টাকা রোজগার করলেই আপত্তি। ধরা না পড়লে বোধ হয় তাতেও আপত্তি থাকত না। যারা চোরাই মালের ব্যবসা করে, তারাও সবাই ভদ্রলোক।

স্বপ্নার প্রেমিক হিসেবেও সে কুলি কিংবা ফেরিওয়ালা হতে পারে না। স্বপ্নার প্রেমিক! মধুময়ের হাসি পায়।

স্বপ্না তাকে সারা জীবনের মতন তার সঙ্গে আর দেখা করতে বারণ করেছে। কখনো পথে দেখা হয়ে গেলেও মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে। তবু মধুময়ের সন্দেহ হয়। স্বপ্না কি সত্যি সত্যিই তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

মধুময় যেমন মনে করে তার হৃদয়ের একটা টুকরো স্বপ্নার কাছে গচ্ছিত আছে, তেমনি স্বপ্নারও হৃদয়ের একটা টুকরো কি মধুময়ের কাছে গচ্ছিত নেই? হঠাৎ এক সময় স্বপ্নারও কি মনে হবে না যে মধুময়কে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না?

মধুময় একবার ভুল করেছে বলে কি স্বপ্না তাকে ক্ষমা করতে পারে না? মধুময়ের মুখ দেখে কি স্বপ্না বুঝতে পারে না যে মধুময় জাত-অপরাধী নয়? মধুময় যদি প্রতিশ্রুতি দেয় তাও স্বপ্না মেনে নেবে না? মধুময় একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে বলে স্বপ্না তাকে আর বিশ্বাস করবে না। খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার আর সহজে টাকা রোজগারের লোভেই মধুময় রজতদের দলে গিয়ে ভিড়েছিল। সে জন্য মধুময় এখনো ঠিক অনুতাপ বোধ করে না। এই সমাজে যারা অন্যায় ভাবে টাকা রোজগার করে, যাদের অতিরিক্ত টাকা আছে, তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা কেড়ে নেওয়াটা তেমন অন্যায় মনে করে না মধুময়। এই সমাজ যখন সমান ভাবে ভাগ করে দিতে পারছে না, তখন কেউ কেউ তো নিজেদের দাবি আদায় করার চেষ্টা করবেই।

তবু স্বপ্নার কথা চিন্তা করেই মধুময় ঐ দিকটা একেবারে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে। সে চাকরি জোগাড় করে ভদ্রলোক সাজবে। বম্বেতে গেলে কিছু একটা [illegible] মনে হয়। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, স্বপ্না [illegible] কাছে ফিরে আসবে কি না। স্বপ্নার জন্যই তো এতখানি আত্মত্যাগ। নইলে নিছক মধ্যবিত্তের মতন সে বম্বে গিয়ে চাকরির হ্যাঙলামি করতে যাবে কেন?

যদি মধুময়ের বদলে স্বপ্না কোন মারাত্মক ভুল করে ফেলত? না, স্বপ্না কোন ভুল কিংবা অন্যায় করবে না, তার নীতিবোধ খুবই পরিচ্ছন্ন এবং গতানুগতিক। সততা আর সারল্যের জন্যই স্বপ্না বেশী সুন্দর। তবু কোন দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে।

স্বপ্না খুব ট্যাক্সি চড়তে ভালোবাসে। একা একা ট্যাক্সিতে যাবার সময় স্বপ্নাকে হঠাৎ কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারত। তারপর স্বপ্নার ওপর বলাৎকার করে তাকে ছেড়ে দিল। হঠাৎ একদিন মধুময় জানতে পারল, স্বপ্না সন্তানসম্ভবা! তখন মধুময় কি করত? সে কি তখন ঘৃণায় আর স্বপ্নার মুখ দেখতে চাইত না?

মধুময়ের পক্ষে তা কি সম্ভব? সেই বিপদের সময় সে-ই তো ছুটে গিয়ে স্বপ্নার পাশে দাঁড়াত। স্বপ্নার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব দিত সে নিজে। সবচেয়ে বড় কথা, স্বপ্নার মনে যাতে কোন আঘাত না লাগে, সেটাই বেশী করে দেখত মধুময়।

কিংবা অন্য রকম কিছুও হতে পারত। স্বপ্না সবাইকে বিশ্বাস করে। মধুময় জানে, স্বপ্নার খুড়তুতো ভাই চাঁদু মোটেই ভালো ছেলে নয়। অল্প বয়েস থেকেই বখে গেছে। বাজে বাজে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেশে চাঁদু—জুয়া-টুয়া খেলে, আরও অন্য কিছু করে কিনা কে জানে!

মধুময় দু' একবার স্বপ্নাকে চাঁদুর কথা বলেছে, স্বপ্না তা উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, যাঃ, চাঁদু খুব ভালো ছেলে, লেখাপড়ায় মাথা নেই, কিন্তু পাড়ার কত লোককে সাহায্য করে।

ধরা যাক, সেই চাঁদু ভুলিয়ে ভালিয়ে স্বপ্নাকে কোথাও নিয়ে গেল তারপর কোন পাপ-চক্রে জড়িয়ে ফেলল তাকে। এমনও তো হতে পারে চাঁদুর বন্ধুরা ক্ষেপে উঠল স্বপ্নার জন্য, তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে একজন খুন হয়ে গেল ওদের মধ্যে। সেই সময় পুলিশ গিয়ে গ্রেফতার করল সবাইকে। খুনের ব্যাপার, নিশ্চয়ই স্বপ্নাকেও জেলে আটকে রাখবে। হঠাৎ সেই খবর শুনে মধুময় কি অমনি ভেবে বসবে যে স্বপ্না তার চোখের আড়ালে উচ্ছন্নে গেছে, সে আর স্বপ্নার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না!

রাস্তায় যেতে যেতে মধুময় থমকে দাঁড়ায়। যেন সে চোখের সামনে দেখতে পায় জেলখানার জেনানা ফাটকে বন্দিনী রয়েছে স্বপ্না। চোখের নিচে দুশ্চিন্তার কালি। ভিজিটার্স রুমে দেখা করতে গেছে মধুময়।

মধুময়কে দেখেই কেঁদে ফেলল স্বপ্না। মুখ ঢেকে সে বলছে, না না, আমি তোমার কাছে আর মুখ দেখাতে চাই না।

মধুময় স্বপ্নার হাতটা ছুঁয়ে বলল, শান্ত হও।

স্বপ্না হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললে, না, তুমি আমায় ছুঁয়ো না, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।

মধুময় বলল, স্বপ্না, মুখ তোল, আমার দিকে তাকাও।

স্বপ্না বলল, আমার এখন মরে যাওয়াই ভালো।

মধুময় বলল, ছিঃ!

স্বপ্না বলল, আর তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই। এ পৃথিবীতে আমার আর স্থান নেই।

মধুময় দৃঢ় গলায় বলল, শোন স্বপ্না, তোমায় যদি কেউ নরকে নিয়ে যেত, আমি সেখান থেকেও তোমায় খুঁজে আনতাম। আমি জানি, তোমার গায়ে ময়লা লাগলেও তোমার মনে কখনো ময়লা লাগতে পারে না। আমি কি কখনো তোমায় ছেড়ে···

রাস্তার লোক অবাক হয়ে মধুময়কে দেখে। সে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে। ঠিক যেন একটা পাগল।

এক সময় মধুময় চমকে উঠে সচেতন হয়ে যায়। লজ্জা পেয়ে সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। সত্যিই তো, স্বপ্নার কথা ভেবে ভেবে সে পাগল হয়ে গেল নাকি?

সাময়িক ভাবে ভুলে থাকার জন্য মাঝে মধ্যে সে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যায়। তবু কিছুতেই সেখানেও মন বসে না। খানিকটা বাদে সে টের পায় যে সিনেমার গল্পটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কারণ সে পর্দার দিকে চেয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার মনের মধ্যে চলছে স্বপ্নার চলচ্চিত্র।

অনেক সময় দেখা যায়, ময়দানে কোন অখ্যাত ক্লাবের ছেলেরা ক্রিকেট প্র্যাকটিস করছে, গায়ে চাদর দেওয়া লম্বা চেহারার মধুময় তাদের একমাত্র দর্শক। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। ইচ্ছে করলে কি মধুময়ও ওদেরই মতন খেলাধুলো করে আনন্দে মেতে থাকতে পারত না? কিন্তু তার জীবনটা বদলে গেছে। সে আর অন্য কারুর মতন নয়।

একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা বাড়ির সামনে মধুময় খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এই বাড়িটা তার খুব চেনা। পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে লোহার গেট, ভেতরে একটু ছোট্ট বাগান, তারপর হলুদ রঙের তিন-তলা। দোতলার ডানদিকে যে ছোট ঝোলানো বারান্দা, সেখানে মধুময় কত দিন দাঁড়িয়ে থেকেছে।

এ বাড়িতে অমল থাকে, মধুময়ের স্কুলের বন্ধু। এক সময় মধুময় এ বাড়িতে প্রায় প্রতি দিন আসত, অমলের মা-বাবা, ভাই বোনেরা সবাই তাকে চেনে। অমলের মা তাকে নিজের ছেলের মতন ভালোবাসতেন। অমলেরও এক সময় খুব শখ ছিল ছবি আঁকার। কত দিন মধুময় আর অমল ঐ ঝুল বারান্দায় বসে ছবি এঁকেছে একের পর এক।

একদিনের ঘটনার পর মধুময় আর এ বাড়িতে আসে না। তখন মধুময় আর অমল ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ওরা দুজনে বসে ছবি আঁকছিল

একদুপুরে, এমন সময় হঠাৎ অমলের বাবা সেখানে এলেন। অমলের বাবাকে অত রেগে যেতে মধুময় আগে কখনো দেখে নি। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, পড়াশুনো নেই, কিছু না, দিনরাত শুধু ছবি আর ছবি! তোরা কালীঘাটের পটো হবি ভেবেছিস! নিকুচি করেছে ছবি আঁকার!

তারপর অমলের বাবা অমলের আঁকা ছবিগুলো খামচে তুলে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

খুব অপমানিত বোধ করেছিল মধুময়, সে নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আসে নি কোন দিন।

এমন কি মধুময় পাটনা থেকে ফেরার পর খবর পেয়েছিল যে অমলের মায়ের খুব অসুখ, তবু সে দেখা করতে আসে নি একবারও। অমলের মা মারা গেছেন।

মধুময় গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে এসে কলিং বেল টিপল।

দরজা খুলে দিল একজন পুরোনো ভৃত্য। এর নাম রাখু। এও মধুময়কে চেনে। সে একটু হেসে বলল, দাদাবাবু অনেক দিন পর এলেন।

অমল আছে?

হ্যাঁ আছেন।

দরজা খুলে রাখু সরে দাঁড়াল। আগেকার দিনে মধুময় সোজা দোতলায় উঠে যেত অমলের ঘরে। রাখু ভেবেছে, মধুময় সেই রকম যাবে।

মধুময়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল, যান না, ওপরে যান, দাদাবাবু একটু আগেই ফিরেছেন।

মধুময় আড়ষ্ট বোধ করল। সে শুনেছে যে এর মধ্যে অমলের বিয়ে হয়ে গেছে। অমল তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেও গিয়েছিল, মধুময় তখন জেলে।

মধুময় বলল, না, আমি নীচের ঘরে বসছি, তুমি দাদাবাবুকে খবর দাও।

অমলদের পরিবার বেশ স্বচ্ছল। তাছাড়া অমল পাশ-টাশ করে একটা চাকরিও পেয়েছে, তারপর বিয়ে করেছে, সে এখন সুখী মধ্যবিত্ত।

মধুময়ের যতদূর মনে আছে এ পাড়ারই রীতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে অমলের খুব ভাব ছিল। অমল কি তাকেই বিয়ে করেছে? অমল স্বপ্নাকেও চেনে।

অমল এলো বেশ খানিকটা দেরি করে।

এই শীতের মধ্যেও সন্ধেবেলা স্নান করেছে অমল, পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর একটা সাদা শাল আলগা ভাবে জড়ানো। সারা গায়ে পাউডারের গন্ধ।

কি রে?

মধুময় কথা না বলে হাসল।

সোফার ওপর বসে পড়ে অমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, খাবি? এতদিন পর হঠাৎ মনে পড়ল?

অমল মধুময়েরও আগে থেকে সিগারেট ধরেছে। আগে অমলকে খুব লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খেতে হত, এখন সে বিবাহিত সংসারী মানুষ বলে বসবার ঘরেই সিগারেট ধরাতে পারে। অমলের বাবা তো যে কোন মুহূর্তে আসতে পারেন এখানে।

মধুময় হাত বাড়িয়ে অমলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বলল, কেমন আছিস?

ভালোই। তোর খবর কী?

চলছে।

মাসীমা কেমন আছেন?

খুবই কাটা কাটা কথাবার্তা। মধুময়ের মনে হল অমলের মুখে যেন অভিমানের ছাপ। মধুময় যে হঠাৎ এ বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিল সেজন্য অমলের তো অভিমান হতেই পারে। বাবা মায়েরা তো ও রকম একটু আধটু বকাবকি করেন তা বলে কি কেউ ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ত্যাগ করে? অমলের বাবা অমলের ছবিই ছিঁড়েছিলেন।

মধুময়ের তো ছেঁড়েন নি। তা ছাড়া মধুময় নিজেই এখন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছে।

একটু পরেই মধুময়ের খেয়াল হল, সে নিজে থেকে দোতলায় উঠে যায় নি, অমলও তো তাকে ওপরে যেতে বলল না। আগে তারা কক্ষনো বসবার ঘরে বসে গল্প করে নি।

অমল নিশ্চয়ই মধুময়ের কীর্তি কাহিনী সব জানে। মধুময়ের নামে যখন মামলা চলছিল। তখন খবরের কাগজে সব ছাপা হয়েছিল। অমল নিশ্চয়ই খবরের কাগজ পড়ে। এমনিতেও এ সব কথা লোকের মুখে মুখে ঠিক রটে যায়।

মধুময় জিজ্ঞেস করল, তুই কি রীতাকে বিয়ে করেছিস?

অমল চকিতে মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দরজার দিকে তাকাল। তারপর একটু বিরক্ত ভাবে বলল, রীতাকে? কেন, রীতাকে বিয়ে করতে যাব কেন? রীতার তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।

বেশী দিনের তো কথা নয়, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধান, তবু যেন মনে হয় এক যুগ পার হয়ে গেছে, ঘটে গেছে কত কিছু, মধুময় তার অনেক কিছুরই খবর রাখে না।

তোর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি না?

দাঁড়া, ডাকছি।

সোফা থেকে উঠতে গিয়েও অমল আবার বসে পড়ে বলল, ও, ও তো বাড়ি নেই, আমার ছোট বোনের সঙ্গে বেরিয়েছে। তুই আগে থেকে খবর দিয়ে আসিস নি, আর একদিন আয়।

মধুময়ের কেন যেন মনে হল, অমল মিথ্যে কথা বলছে অমলের স্ত্রী বাড়িতেই আছে, কিন্তু অমল তার সঙ্গে মধুময়ের আলাপ করিয়ে দিতে লজ্জা পাচ্ছে। অমলের স্ত্রী যদি বলে, এই তোমার সেই বন্ধু, যে ট্রেনে ডাকাতি করেছিল? যে ধরা পড়েছিল একটা বেশ্যার বাড়িতে?

অমল ওর স্ত্রীকে নীচে ডাকতে যাচ্ছিল। তার মানে অমল আর ওকে দোতলার ঘরে নিয়ে যেতে চায় না।

মধুময়ের খুব ইচ্ছে হল একবার দোতলার সেই বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াতে।

মধুময় যদি ওপরে যেতে চায় আর ওপরে গিয়ে দেখে যে অমলের স্ত্রী বাড়িতেই আছে, তাহলে অমল লজ্জা পেয়ে যাবে।

চা খাবি ?

খেতে পারি।

অমল এবার উঠে গিয়ে ভেতরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, রাখু, রাখু—

রাখু এলে মধুময় কি জিজ্ঞেস করবে, বল তো রাখু, তোমার দাদাবাবুর বউ বাড়িতে আছেন কিনা ?

মধুময়ের একটু হাসি পেল।

পরক্ষণেই তার মাথায় আর একটা উদ্ভট চিন্তা জাগল। অমলের কাছে কিছু টাকা ধার চাইলে কেমন হয় ?

মধুময়ের টাকার দরকার নেই। দুটো মাস চালাবার মতন যথেষ্ট হাত-খরচ তার আছে। তবু সে অমলকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে চায়। খুব বেশী নয়, শ' দুয়েক টাকা যদি চাওয়া যায় ? মধুময়ের মতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে অমল নিশ্চয়ই দুশো টাকা ধার দিতে পারে। কিন্তু মধুময় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বলে অমল কি এখন টাকাটা দিতে চাইবে না ? ওর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার মতন কথাটা ঘুরিয়ে দেবে ?

এই সময় লোহার গেট ঠেলে দুটি মেয়ে ভেতরে এলো। একজন অমলের ছোট বোন বনানী, অন্য জন বিবাহিতা। এই নিশ্চয়ই অমলের স্ত্রী। তাহলে তো অমল মিথ্যে কথা বলে নি।

অমল অবশ্য ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল না, অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানতে লাগল।

মধুময় যখন বনানীকে দেখেছে তখন ও ফ্রক পরত, এখন শাড়ি পরে রীতিমত মহিলা হয়ে গেছে। সে অমলের স্ত্রীর সঙ্গে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। মধুময় ডেকে বলল, এই বনানী, কেমন আছিস ?

বনানী ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত ভাবে হেসে বলল, ও মা, মধুদা। চিনতেই পারি নি। আমি ভাবলাম কোন অচেনা লোক। এত বড বড় চুল রেখেছ!

কিন্তু মধুময় খুব ভালো ভাবেই জানে, বনানী তাকে আগেই চিনেছিল ওর চাহনি দেখেই বোঝা যায়। চিনতে পেরেও কথা না বলে চলে যাচ্ছিল।

বনানী বলল, এসো বউদি, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে মধুময়দা, দাদার খুব বন্ধু ছিল, এক সময় খুব আসত আমাদের বাড়ি—

মধুময় উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল, নমস্কার! আপনি আগে আগে আমার কথা শোনেন নি অমলের কাছে? আপনাদেব বিয়ের সময় আমি আসতে পারি নি, তখন আমি জেলে ছিলাম।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো হঠাৎ। কেউ কোন কথা বলল না একটাও।

মধুময় এবার একগাল হেসে বলল, আমি ডাকাতি করতে গিযে ধরা পড়েছিলাম।

এবার অমল সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদ করে বলে উঠল, মোটেই না, কেন ইয়ার্কি করছিস, মধু? সবাই জানে তুই কিছু করিস নি. পুলিশ তোর নামে কোন কেস দিতে পারে নি। জজ তোকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

বনানী বলল, আমবাও কাগজে তাই পড়েছি।

অমল বলল, ওকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়েছিল। আজকাল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এমন অপদার্থ।

বনানী বলল, ইস, তোমাকে অনেক দিন জেলে আটকে রেখেছিল, তাই না মধুদা? রোগা হয়ে গেছ সেই জন্য!

অমলের স্ত্রী বেচারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কী বলবে বা কী করবে বুঝতে পারছে না।

মধুময় ভাবল, ওর তো এমন অবস্থা হবেই। কেননা নিশ্চয়ই মধুময়কে নিয়ে আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে। মধুময় যে ট্রেনে ডাকাতি করেছিল তাতে ওদের কোন সন্দেহ নেই। পুলিশ অনেক সময়ই এ সব প্রমাণ কবতে পারে না, সেই জন্যই তো বাঘা বাঘা উকিলরা রয়েছে। তাছাড়া মধুময় কোথায় ধরা পড়েছিল, তাও তো কারুর আর অজানা নেই।

অমল যে জোর করে মধুময়কে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে, তার মানে ওর স্ত্রীকে জানাতে চায় যে একজন ডাকাত অমলেব বন্ধু নয়। তাও আবাব বিচ্ছিরি ধরনের ডাকাতি। অনন্ত সিংয়ের দলে ভিড়ে কোন রাজনৈতিক ডাকাতি করলেও তবু কিছুটা মান বক্ষা করা যেত।

অমলের স্ত্রী বলল, আপনি বসুন। চা-টা কিছু দেয় নি? আমি দেখছি।

দ্রুত পায়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

এরপর চায়ের সঙ্গে মিষ্টিও এলো। অমল জোর করে ছাত্র বয়সের গল্প করতে লাগল। হেসে উঠল কয়েকবার। যেন মধুময়েব সঙ্গে তার আগের মতনই বন্ধুত্ব আছে।

কিন্তু মধুময় যেই বলল, এবার উঠি। অমল তার উত্তরে বলল না, আর একটু বোস। সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

বাইরের লোহার গেটটাব কাছে এসে মধুময়ের মনের মধ্যে আবাব বিড়বিড় কবে উঠল। অমল তাকে একবাবও দোতলার ঘবে যেতে বলল না। অমলের বউ কিংবা বনানী আর ফিরে এলো না। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য।

গেটটা খোলার জন্য হাত দিয়েও থেমে গিয়ে মধুময় বলল, তোরা বললি আমি নির্দোষ, পুলিশ আমায় মিথ্যে মামলায় জড়িয়েছিল, কিন্তু স্বপ্না সে কথা বিশ্বাস করে না।

অমল বলল, স্বপ্নার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। কেমন আছে স্বপ্না?

আমার সঙ্গে দেখা হয় না।

ও।

একটু থেমে মধুময় বলল জানিস অমল, আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই ট্রেনে ডাকাতি করেছিলাম।

একটুও না চমকে অমল তেতো গলায় বলল, কেন গিয়েছিলি! তোর কি এতই টাকার অভাব? মেসোমশাই তো এখনো চাকরি করছেন।

আমি কোন চাকরি পেলাম না।

চাকরি না পেলেই কি ভদ্দরলোকের ছেলেরা ডাকাতি করে? এখন তোর একটা বাজে রেকর্ড হয়ে গেল, এখন কে তোকে চাকরি দেবে?

অমল তুই আমার একটা উপকার করবি? বিশেষ দরকার, তুই আমাকে দুশো টাকা ধার দিবি?

যতটা চমকানো উচিত ছিল, ততটা চমকাল না অমল। সে যেন এ রকম কিছুরই প্রতীক্ষা করছিল। একটা কোন মতলব না থাকলে কি মধুময় হঠাৎ এমনি এসেছে এত দিন বাদে!

ভাবলেশহীন গলায় অমল বলল, কিন্তু আমার যে একদম হাত খালি ভাই। গত মাসে দার্জিলিং গিয়েছিলাম বাড়ির সবাইকে নিয়ে। তাতেই একেবারে ফতুর হয়ে গেছি।

কিছু দিতে পারিস না? অন্তত শ দেড়েক? বিশেষ দরকার বলেই বলছি।

খুব মুশকিলে ফেললি···গোটা কুড়ি তিরিশ টাকা দিতে পারি বড় জোর।

আচ্ছা থাক।

গেট খুলে বেরিয়ে গেল মধুময়। হাসি মুখে বলল, চলি।

মধুময় কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর অমল বলল, গোটা পঞ্চাশেক হলে যদি চলে, কিংবা সামনের সপ্তাহে—

মধুময় বলল, না থাক, তার আর দরকার হবে না।

কিছু দূর যাবার পর মধুময়ের মুখ থেকে হাসিটা আপনা আপনি মুছে গেল। এ রকমই তো হবার কথা ছিল। মধুময় কি অন্য রকম কিছু আশা করেছিল? অমল তো এর থেকেও খারাপ ব্যবহাব কবতে পারত।

মন খারাপ—মন খারাপ—মন খাবাপ—প্রতি পদক্ষেপে মধুময়েব মন খারাপ বাডতে লাগল, তাব কোথাও যাবার জায়গা নেই।

এ সবই বদলে দিতে পাবে স্বপ্না। যদি স্বপ্না একবাব এসে বলে, আমি তোমায় ভুল বুঝি নি—অমনি মধুময় অন্য মানুষ হয়ে যাবে। সে স্বপ্নার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিযে অগ্রাহ্য করবে পৃথিবীব আব সব কিছু।

অথবা, এক্ষুনি হাতে একটা ছুরি নিয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেও মধুমযেব মন খাবাপ কেটে যেতে পারে।

॥ ছয় ॥

মধুময়দের বাড়ির সদর দরজাটা দিয়ে ঢুকেই একটা ছোট মতন গলি। সেখানে ওদের চিঠির বাক্স। সদর দরজা প্রায় সারাদিন খোলা থাকে বলে চিঠির বাক্সে তালা দেওয়া।

পোস্টম্যান যখন চিঠি দিতে এসেছে, ঠিক সেই সময় মধুময় বেরুচ্ছিল। পোস্টম্যানের কাছ থেকে সে চিঠিগুলো চেয়ে নিল। ভাগ্যিস নিয়েছিল! নইলে এ চিঠিটাও পড়ত বাবার হাতে।

সাদা শক্ত কাগজের লম্বা খামটা মধুময় চট করে ভরে নিল নিজের পকেটে, বাকি চিঠিগুলো ফেলে দিল বাক্সে।

বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে মধুময় পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে খুলল। বোম্বাই থেকে তার মামা প্রায়ই মধুময়কে তাড়া দিয়ে চিঠি লিখছেন। মধুময় যেন অবিলম্বে সেখানে চলে আসে। এই চিঠিখানা খুবই জরুরি।

বড় মামা লিখেছেন যে মধুময়ের জন্য তিনি একটি চাকরি প্রায় পাকা করে ফেলেছেন। একটা নাম-করা ওষুধ কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেইনী, এখন পাবে আটশো টাকা। ছ' মাসে ট্রেনিং কমপ্লিট করতে পারলে বারোশো থেকে আঠারোশো টাকা স্কেলে পোস্টিং হবে, সঙ্গে আরও নানা রকম সুযোগ সুবিধে আছে। বোম্বাইতে বাড়ি ভাড়া পাওয়া খুব শক্ত। এই কোম্পানি ফ্ল্যাটও দেবে।

মধুময়ের যা যোগ্যতা, তাতে এর চেয়ে ভালো কাজ সে নিজে কখনো জোগাড় করতে পারবে না। এই চাকরিটা তার এক্ষুনি লুফে নেওয়া উচিত। এর পর থেকে সে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারে।

বড় মামা লিখেছেন, এ মাসের সাতাশ তারিখে শুধু একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে যদিও, তবুও ওটা শুধু নিয়মরক্ষার জন্য। মধুময় যেন যত তাড়াতাড়ি ১ ২৮ বোম্বাই চলে আসে।

মধুময় একবার ভাবল, চিঠিখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রাস্তায় উড়িয়ে দেবে। পরে বড়মামা বাবাকে কিছু জানালে মধুময় অনায়াসেই বলতে পারবে, কই, আমি তো সে রকম কোন চিঠি পাই নি!

আবার একটু ভেবে, চিঠিখানা না ছিঁড়ে পকেটেই রেখে দিল। এ মাসের সাতাশ তারিখ, তার মানে এখনো আটদিন দেরি আছে। পঁচিশ তারিখে শেষ হচ্ছে মধুময়ের দু'মাসের ব্রত। যদি সে যাওয়া ঠিক করে, তাহলে পঁচিশ তারিখ রাত্তিরেও সে প্লেনে করে বোম্বাই পৌঁছে যেতে পারে।

যদি সে যায়! সে যাবে কি না, নির্ভর করছে স্বপ্নার ওপরে। স্বপ্না যদি তাকে ক্ষমা করে, তাহলেই শুধু সে সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবনে ফিরে যা'বে। বোম্বাইতে বড় কোম্পানির অফিসার, সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

স্বপ্না যদি না চায়, তাহলে এ সব চাকরির কোন মূল্যই নেই মধুময়ের কাছে। বারোশো টাকা মাইনে? ফুঃ! ধনার প্ল্যান অনুযায়ী একটা গাড়ি মল্লিকবাজারে ডেলিভারি দিলেই দু'হাজার টাকা হাতে আসবে।

বড়মামা যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন তাঁর গাড়িতেই মধুময় ড্রাইভিং শিখেছিল। সে ঝড়ের মতন উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে গাড়ি। ধনার সঙ্গে এক মাসে সে তিরিশখানা গাড়ি হাওয়া করে দিয়ে রোজগার করতে পারে ক্যাশ ষাট হাজার টাকা। সে আর কোন দিন ছবি আঁকবে না। সে ধনা আর রতনদের মতন মুখ খিস্তি করবে সব সময়। সে অন্য জীবন বেছে নেবে, যে জীবন অনেক বেশী রোমাঞ্চকর।

তখন সব সময় কাছে একটা ছুরি রাখবে মধুময়। কিংবা রিভলবার। তখন কেউ তাকে ধরতে এলে আর বোকার মতন ধরা দেবে না সে।

স্বপ্না থাকলে এক রকম জীবন, স্বপ্নাকে বাদ দিয়ে আরেক রকম জীবন। স্বপ্নার কাছে তার আত্মার একটা টুকরো জমা রয়ে গেছে, যা আর কখনো ফেরৎ নেওয়া যায় না। স্বপ্না যদি একেবারে দূরে সরে যায়, তাহলে অর্ধেক আত্মা নিয়ে মধুময় দিন দিন অমানুষ হয়ে উঠবে।

*　　*

সেদিন স্বপ্নাকে মধুময় আবিষ্কার করল দুপুরবেলা মেট্রো সিনেমার সামনে। স্বপ্না চঞ্চল ভাবে ঘড়ি দেখছিল। মধুময় একটু দূরে দাঁড়াল। যাতে স্বপ্না তাকে দেখতে না পায়, কিন্তু সে ঠিক নজর রাখতে পারে। স্বপ্না খুবই ব্যস্ত ভাবে ছটফট করছে।

ঠিক তিনটে বেজে দশ মিনিটে একটি ফিয়াট গাড়ি এসে থামল তার সামনে। একটি অতিরিক্ত ভালো পোশাক পরা যুবক তার থেকে নেমে প্রচুর ক্ষমা চাইতে লাগল দেরি হবার জন্য।

স্বপ্নার ভুরু কুঁচকে ছিল, আস্তে আস্তে তা সরল হল। তারপর সে হাসল। একটু পরেই ওরা দুজনে চড়ে বসল গাড়িতে। গাড়িটা ভোঁ করে বেরিয়ে গেল। মধুময় দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র পনেরো কুড়ি গজ দূরে। ওদের দুজনের কেউই তাকে লক্ষ্য করে নি।

ঐ ছেলেটিকে চেনে মধুময়। কয়েকদিন ধরে স্বপ্নার সঙ্গে ওকে দেখছে। ছেলেটি একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়কের ছোট ভাই। নিজেও গান-টান গেয়ে কিছু নাম করেছে। ওর নাম সুরজিৎ।

গাড়িতে ওঠবার সময় সুরজিৎ আর স্বপ্না এমন গাঢ় ভাবে তাকিয়ে ছিল পরস্পরের দিকে, যা শুধু প্রেমিক প্রেমিকারাই তাকায়।

মধুময় একটু হাসল। বিবাহিত পুরুষদের স্ত্রী মারা গেলে অন্তত দু-এক বছরের আগে তারা নতুন বিয়ে করে না। মেয়েদের বুঝি অত দেরি সয় না। স্বপ্নার কাছে এখন মধুময় মৃত কি না কে জানে। তাহলেও মাত্র এই ক'মাসের মধ্যেই সে আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলল!

চট করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মধুময় অনুসরণ করতে লাগল ফিয়াট গাড়িটাকে। আর কয়েক দিন বাদে, মধুময় যদি অন্য রকম জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে কিছু দিনের মধ্যে সেও ও রকম একটা ফিয়াট গাড়ি কিনে ফেলতে পারবে।

সামনের গাড়িটা চলল হাওড়ার দিকে। মধুময় ভেবেছিল, ওরা ট্রেনে চেপে কোথাও যাবে। কিন্তু গাড়িটা হাওড়া স্টেশনে ঢুকল না, বাকল্যাণ্ড ব্রীজের ওপর উঠল।

মধুময় শুধু লক্ষ্য করছিল, ওরা কতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। স্বপ্না কতটা বদলেছে? সে কি তার নতুন প্রেমিকের সঙ্গে শরীর ছোঁয়াছুঁয়ি করতে রাজী হয়েছে? একটু নির্জন রাস্তায় সে কি সুরজিৎকে টপ করে একটা চুমু খাবার অনুমতি দেবে?

সে রকম কিছু ঘটল না। স্বপ্না খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেই বসে রইল আগাগোড়া। তবে সুরজিৎ নামের ছেলেটি বড় বেশী সিগারেট খায়। গাড়ি চালাতে চালাতে সে সিগারেট ধরাচ্ছিল, একবার স্বপ্না বুঝি তাকে বকল, তারপর নিজেই লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল ওর সিগারেট।

গাড়িটা থামল শিবপুর বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের সামনে।

মধুময় অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হল। এই বাগানেও ইচ্ছে করলে চুমু-টুমু খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। সেই সুযোগ কি ওরা নেবে? মধুময় শুধু দেখে নিতে চায়।

আর মাত্র সাত দিন। তারপরেই স্বপ্নার মুক্তি। মধুময়েরও মুক্তি। স্বপ্নার কাছে তার আত্মার যে টুকরোটা জমা আছে, আর সাতদিন পরে মধুময় সেটার দাবি একেবারেই ছেড়ে দেবে।

ওরা বাগানের মধ্যে ঢুকে যাবার বেশ খানিকক্ষণ পর মধুময় ঢুকল। সে ওদের ঠিক খুঁজে নিতে পারবে। এই কয়েক সপ্তাহে মধুময় অনুসরণ করার ব্যাপারে পুলিশের গোয়েন্দাদের চেয়েও দক্ষ হয়ে উঠেছে।

ছুটির দিন নয়, তাই বেশী ভিড় নেই। যারা এসেছে, তারা সবাই প্রায় প্রেমিক প্রেমিকা। মধুময়ের সঙ্গেও স্বপ্না দু'বার এসেছে এখানে। স্বপ্নার সে সব কথা মনে পড়ছে না? কিংবা স্বপ্না মন থেকে মধুময়কে একেবারেই মুছে ফেলেছে?

স্বপ্না আর সুরজিৎ প্রথমে খানিকটা ঘুরতে লাগল এলোমেলো। সুরজিৎ এক একবার স্বপ্নার হাত ধরতে চাইছে, আর স্বপ্না ছাড়িয়ে নিচ্ছে হাত। কিন্তু তার মুখে হাসি। খুব নীচু গলায় গান গাইছে স্বপ্না। সুরজিৎ তো রীতিমত গায়ক, কিন্তু সে গান গাইছে না।

একবার ওরা ঢুকল একটা অর্কিড হাউসে। ওখানে মধুময় যেতে পারবে না। তাহলে নির্ঘাৎ ওদের চোখে পড়ে যাবে। বাইরে থেকে লোহার সিকের ফাঁক দিয়ে মধুময় চোখ রাখতে লাগল ওদের ওপর। সুরজিতের চুমু-টুমু খাওয়ার বেশ ইচ্ছেই আছে মনে হয়। সে মাঝে মাঝেই স্বপ্নার কাঁধে হাত রাখতে চাইছে, কিন্তু স্বপ্না ঠিক সুযোগ দিচ্ছে না।

মধুময় বেশ উপভোগই করছে ব্যাপারটা। সে কখনও রাস্তাঘাটে মেয়েদের পিছু নেয় নি। আর এই প্রায় দু'মাস সে প্রথম একটি মেয়ের পিছু পিছু ঘুরছে, যার সঙ্গে তার অন্তত দশ বছরের নিবিড় পরিচয়। যাকে সে মনে করত সবচেয়ে আপন। অথচ সে স্বপ্নার সঙ্গে একটাও কথা বলছে না।

স্বপ্না বেড়াতে ভালোবাসে। মধুময়ের সঙ্গেও সে প্রায়ই বেড়াতে যেত। কিন্তু তখন কি স্বপ্নাকে এত খুশি খুশি দেখাত? এখন যেন স্বপ্না বেশী উজ্জ্বল!

অর্কিড হাউস থেকে বেরিয়ে স্বপ্না আর সুরজিৎ গেল ঝিলটার ধারে। এখানে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়।

স্বপ্নাই বলল নৌকো চড়ার কথা। সুরজিতের খুব একটা ইচ্ছে নেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় সে সাঁতার জানে না। কিন্তু সে কথাটা স্বপ্নার কাছে বলতেও লজ্জা পাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সুরজিৎ রাজি হল। দরাদরি হল নৌকোওয়ালার সঙ্গে। দুজনে নৌকোয় উঠেও বসল। হঠাৎ সুরজিৎ পকেটে হাত দিয়ে বলল, সিগারেট দেশলাইটা গাড়িতে ফেলে এসেছি!

স্বপ্না বলল, থাক, সিগারেট খেতে হবে না।

অনেকক্ষণ খাই নি। দৌড়ে গাড়ি থেকে নিয়ে আসব।

স্বপ্না বলল, না।

সুরজিৎ নৌকোয় চড়ার নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য সিগারেট ছাড়া থাকতে পারবে না। সে এবার বলল, মানি ব্যাগটাও রেখে এসেছি গাড়িতে। নৌকোর ভাড়া দিতে হবে না?

স্বপ্না বলল, আমার কাছে পয়সা আছে।

সুরজিৎ বলল, তাহলেও মানি ব্যাগটা গাড়িতে ফেলে রাখা মোটেই ঠিক হবে না। প্লিজ, এক্ষুনি আসছি।

আচ্ছা, নিয়ে এসো।

নৌকো থেকে নেমে দৌড় শুরু করার আগে সুরজিৎ ঠাট্টা করে বলে গেল, দেখো, আবার একলা একলা ভেসে যেও না যেন।

স্বপ্না কিন্তু নৌকোয় বসে রইল না। সুরজিৎ চলে যেতেই নৌকো থেকে নেমে দ্রুত পায়ে একটা ফুলগাছের ঝোপের এপাশে এসে মধুময়ের মুখোমুখি দাঁড়াল।

তুমি কী চাও?

মধুময় একটুও চমকে যায় নি। সে সদ্য একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সে ভাবছিল, সিগারেটের প্যাকেটটা সে সুরজিৎকে উপহার দেবে কিনা। বেচারা অত দূরে গাড়ি পর্যন্ত দৌড়ে যাবে আসবে!

কিছু চাই না তো।

বেশী রাগ হলে স্বপ্না কেঁদে ফেলে। মধুময় জানে সে কথা। এখনও স্বপ্না কাঁদে নি অবশ্য। কিন্তু চোখ ছলছল করছে।

তুমি কেন সব সময় দিনের পর দিন, আমার পেছনে পেছনে ঘুরছ? তুমি কি ভাবো, আমি তোমাকে দেখতে পাই না?

আমি যদি তোমায় দূর থেকে দেখতে চাই, সেটাও কি অপরাধ? তুমি তো আমায় বারণ করেছিলে তোমাদের বাড়িতে যেতে। সেখানে তো আর যাই নি আমি। এমন কি তোমাদের পাড়াতেও আমি যাই না—

কিন্তু আমি বলেছিলাম, আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। তবু তুমি কেন আমাকে জ্বালাতন করছ?

জ্বালাতন! আমি বুঝতে পারি নি।

দিনের পর দিন সব সময় যদি বোঝা যায় একজন কেউ নজর রাখছে তার ওপর কেউ সহ্য করতে পারে?···এ রকম করলে আমি পাগল হয়ে যাব।

নজর রাখার জন্য নয়, আমি শুধু দূর থেকে তোমায় দেখতাম।

সেদিন ডায়মণ্ড হারবারে ওপারে লঞ্চ থেকে নামবার সময় একটা লোককে তুমি ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে। আমি জানি। লোকটা যদি মরে যেত!

সেই ছেলেটা তোমাদের অপমান করেছিল, দরকার হলে আমি ওকে মেরেই ফেলতাম···এমন কি ট্রেনে সেই মাতালটা—

তুমি বুঝি আজকাল খুন জখমও শিখেছ? সে তোমার যা খুশি কর···কিন্তু তোমায় কে অধিকার দিয়েছে আমার ওপর পাহারাদারি করবার? আমার কোন দরকার নেই।

মধুময় দ্রুত ভেবে নিল, হ্যাঁ, সত্যিই এখন দরকার নেই। এখন তো স্বপ্নার সঙ্গে সুরজিৎ থাকেই। কিন্তু সুরজিৎও যদি স্বপ্নার অমতে স্বপ্নাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে মধুময় নিশ্চয়ই সুরজিতের মাথাটা ভেঙে দিত।

স্বপ্না বলল, আমি যখন যেখানে যাই, সিনেমায়, বন্ধুর বাড়িতে, গানের ক্লাসে, সব সময় তুমি আমার পেছন পেছন ঘোরো। কেন?

মধুময় চুপ করে রইল।

আজও এখানে ঢোকার পরই আমি তোমায় দেখতে পেয়েছি। সব সময় পেছন পেছন কেউ আসছে, এটা জানতে পারলে মানুষের কি বেড়াতে ভালো লাগে? তোমার জন্য কি আমি বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দোব?

উত্তর না দিয়ে মধুময় ভাবল, মেয়েদের মাথার পিছনেও চোখ থাকে, সেইজন্য তারা দেখতে পায়। স্বপ্না জানে যে মধুময় তাকে দেখছে, সেই জন্যই কি সে সুরজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে নি গাড়িতে? সেইজন্যই কি সে সুরজিৎকে চুমু খেতে দেয় নি?

মধুময় উত্তর দিচ্ছে না দেখে স্বপ্না আরও রেগে গেল। সে বেশ উঁচু গলায় বলল, তুমি অর্কিড হাউসের গরাদের ফাঁক দিয়ে বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে ছিলে আমাদের দিকে। কেন? তুমি কেন এ রকম ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে?

স্বপ্না বোধ হয় এবার কেঁদেই ফেলবে। মধুময়ের একটা কিছু বলা উচিত।

মধুময় খুব বিনীত গলায় বলল, আমার ভুল হয়েছিল। আজই শেষ, আর কোন দিন তুমি আমায় দেখতে পাবে না।

স্বপ্না বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

স্বপ্না, তুমি কেঁদো না। আমি আর তোমায় কষ্ট দেবো না। আমি তোমার জীবন থেকে সরে যাচ্ছি। এবার আমার অন্য জীবন শুরু হবে।

দয়া করে তুমি আমায় মুক্তি দাও।

কথা দিলাম, তুমি আমায় আর কোন দিন দেখতে পাবে না।

স্বপ্না চঞ্চল হয়ে দূরের দিকে তাকালো। মধুময় জানে যত জোর দৌড়েই যাক সুরজিৎ এর মধ্যে ফিরতে পারবে না।

মধুময় বলল, আকাশ মেঘলা, হঠাৎ ঝড় উঠতে পারে, বেশীক্ষণ নৌকোয় থেকো না।

স্বপ্না ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, তোমার তা ভাববার দরকার নেই। আমার জন্য তোমায় আর কিছু ভাবতে হবে না।

আচ্ছা।

স্বপ্না ঘুরে চলে যাচ্ছিল, মধুময় হাত তুলে বলল, দাঁড়াও, আর একটা কথা—

কী ?

জেল থেকে আমি তোমায় তিনখানা চিঠি লিখেছিলাম, তুমি কি সত্যিই সেগুলো পাওনি ?

না।

সেই চিঠিতে আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম তোমার কাছে। আমি জীবনে একবার ভুল করেছি। তার জন্য কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না ?

ভুলের প্রশ্ন নয়। সে হলে অন্য কথা ছিল। তুমি আমাকে সাঙ্ঘাতিক অপমান করেছ।

অপমান ?

নিশ্চয়ই ! তুমি রেল-ডাকাতি করতে গিয়েছিলে। সেটাকেও না হয় আমি একটা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে মেনে নিতাম। কিন্তু তুমি আমাকে না জানিয়ে, গোপনে একটা খারাপ মেয়ের বাড়িতে রাত কাটাতে যেতে···তুমি আমাকে মুখে ভালোবাসার কথা বলে একটা বাজারের মেয়ের কাছে···ছি, ছি, ছি—

মধুময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বল, তুমি সত্যি করে বল, তুমি সেই মেয়েটার বাড়িতে রাত কাটাও নি ? পুলিশ সেখান থেকে তোমায় ধরে নি ? বল, তুমি সেখানে যাও নি ?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

তোমার লজ্জা করে না ! তারপরেও তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে আসো !

আর আসব না। তুমি মুক্তি চাইলে, মুক্তি দিলাম।

গেট বেশ অনেকটা দূর, তবু এর মধ্যেই সেখান থেকে ফিরে এসেছে সুরজিৎ। দূর থেকেই সে দেখেছে স্বপ্নাকে একজনের সঙ্গে

কথা বলতে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে গেছে তার।

স্বপ্না সুরজিতের হাত ধরে বলল, চল।

কয়েক পা এগিয়ে একবার পিছন ফিরে মধুময়ের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করল, কী বলছিল লোকটা? তোমার আগে থেকে চেনা?

স্বপ্না বলল, হ্যাঁ।

কে?

এমনিই চেনা, আমাদের আগেকার পাড়ায় থাকত।

মধুময় তার পরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। সুরজিৎ আর স্বপ্নার নৌকোয় ওঠা দেখল। স্বপ্নার মুখখানা লাল। এখনো সে ভেতরে ভেতরে রাগে গজরাচ্ছে নিশ্চয়ই।

মধুময় ভাবল, স্বপ্না ভালো সাঁতার জানে। নৌকোটা যদি উল্টেও যায়, স্বপ্নাই বাঁচিয়ে দিতে পারবে সুরজিৎকে। মধুময়ের সাহায্যের দরকার হবে না।

নৌকোটা ছেড়ে যেতেই মধুময় ফিরল।

গেট পেরিয়ে এসে পকেট থেকে বের করল বড় মামার চিঠিখানা। কোন দ্বিধা না করে সেটাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিল হাওয়ায়। অস্ফুট গলায় বলল, বিদায়! বিদায় বোম্বে! ঐ জীবন আমার চাই না!

বাসে চেপে খানিকটা গিয়ে আবার নেমে পড়ল মধুময়। একটা রিক্শা নিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে তারপর এসে নামল গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে। সদর দরজা খোলা। মধুময় উঠে এলো দোতলায়। একটা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল দু'বার।

মুক্তো বোধ হয় ঘুমোছিল তখন। ঘুম-চোখের বিস্ময় অনেক বেশী দেখায়।

কি গো, তুমি? তুমি আবার এসেছ! তোমার সাহস তো কম নয়!

মধুময় গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি আমায় চিনতে পেরেছ ?

কেন চিনব না? তুমি তো সেই নাড়ুগোপাল! এসো, ভিতরে এসো।

মধুময় বলল, না, ভেতরে যাব না। আমি তোমার কাছে দু-একটা কথা জানতে এলাম।

মুক্তো বলল, ভেতরে এসো না। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হয় ?

মধুময় তবু সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, তুমি কোর্টে দাঁড়িয়ে কেন বললে, তুমি আমায় চেনো না ? তোমার বলা উচিত ছিল, আমি তোমার সঙ্গে বিছানায় রাত কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে চোরাই মাল ছিল। তুমি এ কথা বললে আমার নির্ঘাৎ জেল হত। তুমি কেন সত্যি কথা বল নি ?

কেন, খুব জেল খাটার শখ হয়েছে বুঝি ?

আমার শাস্তি পাওনা ছিল।

মুক্তো মধুময়ের হাত ধরে টেনে জোর করে ঘরের মধ্যে এনে বলল, একটু বস না বাপু! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার কথা কী ? চা খাবে ?

না। আমি এক্ষুনি চলে যাব।

আহা রে, তোমার মুখখানা এত শুকনো কেন গো ? কেউ বুঝি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছে ?

মধুময় জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, না না, কে আবার দুঃখ দেবে! আমি সহজে দুঃখ পাই না।

মুক্তো তার শরীরটাকে যেন গ্রাহ্যই করে না। সায়া ও ব্রেসিয়ারের ওপর একটা পাতলা শাড়ি জড়ানো। মাঝে মাঝেই আঁচলটা খসে যাচ্ছে বুক থেকে, সে সম্পর্কে তার কোন হুঁশ নেই। আবার প্রলোভন দেখাবারও যে কোন চেষ্টা নেই, তাও বোঝা যায়।

মধুময় মুক্তোর চোখে চোখ রেখে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমায় চেনো না! তবু তুমি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে কেন ?

শোন ছেলের কথা! কেন আবার কী? আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই!

পুলিশ তোমার ওপর অত্যাচার করেছিল?

দু-চার ঘা চড় চাপড় দিয়েছিল। ও রকম মার খাওয়া আমাদের ঢের অভ্যাস আছে। দাঁড়াও, চা বানাই।

না থাক, আমি চা খাব না।

বীয়ার-টিয়ার খাবে? আনাব?

কিচ্ছু না।

ওরে বাবা, তুমি যে দেখছি একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ! তা হঠাৎ এত দিন বাদে এ সব কথা?

মধুময় বলল, তোমার কাছে আর একটা কথা জানতে চাই। আমি যদি আবার কখনও হঠাৎ অসময়ে এসে পড়ি, তুমি কি আমায় থাকতে দেবে?

মুক্তো মধুময়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, তোমাকে আমি একটা কথা বলব? তুমি ও সব গুণ্ডামি বদমাইসীর লাইনে যেও না। ও সব তুমি পারবে না। তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তুমি ভালো ছেলে।

মধুময় চোয়াল শক্ত করে মুখখানাকে নিষ্ঠুরের মতন করে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমায় তখন থাকতে দেবে কি দেবে না?

মুক্তো হাসতে হাসতে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, না!

মধুময় উঠে দাঁড়াল।

অমনি রাগ হল বুঝি? চলে যাচ্ছ যে?

মুক্তো মধুময়ের মাথার চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলল, তোমার যখন খুশি চলে এসো আমার কাছে···টাকা থাক বা না থাক। সে সব চিন্তা করতে হবে না···তোমার মন খারাপ হলেই আমার কাছে চলে আসবে, কেমন?

মধুময়ের হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। কান্না লুকোবার জন্যই সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ সাত ॥

বিকেল বেলা সাঙ্ঘাতিক ধূলোর ঝড় উঠেছিল, তারপর থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। বছরের এই সময়টা লোকে ছাতা নিয়ে বেরোয় না, তাই রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। ধনা আর মধুময় এসে দাঁড়াল লাইটহাউস সিনেমার সামনে। সন্ধ্যে সাতটা বাজে।

অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ঘুরে ঘুরে পছন্দ করতে লাগল গাড়ি। ধনা আবার প্লেট দেখেও বুঝতে পারে কোন্ গাড়িটা কত নতুন। শুধু চকচকে চেহারা দেখলে বিশ্বাস নেই।

একটা কচি কলাপাতা রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি পছন্দ হল ওদের। ভেতরে ড্রাইভার নেই।

মধুময় পরে আছে একটা ক্রিম রঙের স্যুট, গলায় টাই। এই পোশাকে সে কয়েকবার চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। আজও এক রকম ইন্টারভিউ দিতেই এসেছে। ধনা পরেছে পাজামা আর একটা ধার করা সিল্কের পাঞ্জাবী। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা।

কোটের পকেট থেকে একতাড়া চাবি বার করে মধুময় প্রথম চেষ্টাতেই খুলে ফেলল দরজাটা। গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে সে দরজাটা খুলে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল চুপ করে। দেখা দরকার, কেউ কোন প্রতিবাদ করে কিনা। এখান থেকে পালাবারও সুবিধে আছে, দৌড়ে কোন ক্রমে নিউ মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলেই হল।

কেউ কিছু বলল না।

ধনা গাড়িতে ওঠে নি। সে খুব সপ্রতিভ ভাবে বলল, ব্যাক কর, ব্যাক কর। পেছনে অনেকটা জায়গা আছে।

মধুময় গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ব্যাক গীয়ার লাগাল। খুব সহজেই বেরিয়ে এলো গাড়িটা। মধুময় ঘুরিয়ে নিল ডানদিকে। তারপর সামনের সীটের দরজাটা খুলে দিতেই ধনা উঠে পড়ল চট্ করে।

মধুময় অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিল। সাঁ করে এগিয়ে আবার ঘুরল ডানদিকে। লিণ্ডসে স্ট্রীট দিয়ে এসে চৌরঙ্গি, তারপর পার্ক স্ট্রীটের উল্টোদিকে ময়দানের রাস্তা। ধনার চোখে মুখে উল্লাস ফেটে পড়ছে একেবারে।

দেখলি তো, কত সোজা!

মধুময় সত্তর-আশী কিলোমিটার স্পীডে রেড রোড দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটার পিক আপ ভালো। চালিয়ে আরাম আছে।

গঙ্গার ধার দিয়ে ওয়াটগঞ্জের দিকে ঘুরে মধুময় আবার ফিরে এলো ময়দানে।

ধনা বলল, একটু অন্ধকার দেখে গাড়িটা একবার থামা।

কেন?

আমার ঝোলাতে দুটো ফল্‌স নাম্বার প্লেট আছে, সেগুলো লাগিয়ে দেব, তাহলে আর কোন শালা কিছু করতে পারবে না।

তার দরকার নেই।

হ্যাঁ, অবশ্য, সিনেমা ভাঙতে ভাঙতে আমাদের ডেলিভারি হয়ে যাবে। তার আগে তো কেউ আর খোঁজ করবে না! এখন চল, মল্লিকবাজারের দিকে।

আমার একটু ঘুরতে ইচ্ছে করছে, অনেক দিন বাদে গাড়ি চালাচ্ছি তো!

তোর হাত দারুণ মাইরি!

আরও আধঘণ্টা গাড়িটা নিয়ে গঙ্গার ধারেই ঘুরপাক খেল মধুময়। পেট্রলের কাঁটাটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর বেশী ঘোরা যাবে না।

গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে মধুময় আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কাজটা সত্যিই খুব সোজা।

ধনা অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, তোকে বলেছিলাম না? কোন রিস্ক নেই। কোন শালা ধরতে পারবে না।

মধুময় বলল, এবার ফেরার পালা।

ধনা বলল, সার্কুলার রোড দিয়ে সোজা বেরিয়ে চল মল্লিকবাজার।

মধুময় বলল, আজ মল্লিকবাজার যাব না।

ধনা বলল, তার মানে? তাহলে কোথায় যাবি? তুই এখন বেশী দেরী করলেই বিপদ। আমি সব কথা বলে এসেছি, গাড়ি ডেলিভারি দিলেই—

আমি এখন গাড়িটা ফেরৎ রেখে আসব।

কি পাগলের মতন কথা বলছিস!

আজ ট্রায়াল দিলাম। দেখলাম, পারা যায় কিনা। দেখা হয়ে গেল, এখনও শো ভাঙে নি···এখন গাড়িটা ঠিক জায়গায় রেখে এলে গাড়ির মালিক কিছু টেরই পাবে না।

কিন্তু গাড়িটা ফেরৎ রেখে আসবি কেন? এক্ষুনি গাড়িটা ডেলিভারি দিয়ে এলেই তো ক্যাশ চার হাজার টাকা। তোতে আমাতে সমান সমান।

তোকে আমি বলেছিলাম না আমার একটা ব্রত আছে···এক মাস তেইশ দিন বাদে আমার যা ঠিক করার করব? তার এখনো তিন দিন বাকি। আমি এ লাইনেই যাব, কিন্তু সেই তিনদিন কেটে না গেলে কাজ শুরু করব না, আজ শুধু ট্রায়াল দিতে এলাম।

ছাখ মধু, ইয়ার্কি করিস না, গাড়ি ঘোরা।

না ইয়ার্কি না। মাত্র আর তিনটে দিন ওয়েট করতে পারবি না? বললাম না, আমার একটা ব্রত আছে।

ব্রত আবার কী? তুই কি মেয়েছেলে নাকি যে ব্রত করবি!

সত্যি অনেকটা যেন মেয়েছেলের মতনই হয়ে গেছি রে। যাক, আর তো মোট তিনটে দিন। আমি এক কথার মানুষ রে ধনা! আমি যখন তখন মত বদলাই না।

তা বলে তুই গাড়ি ফেরৎ দিতে যাবি? পাগল ছাড়া কেউ এ কথা বলে? গাড়িটা এখানেই ফেলে রেখে যা।

তার দরকার নেই, এখনও অনেক সময় আছে।

ধনা চিৎকার করে উঠল, আমায় নামিয়ে দে! আমায় শিগগির নামিয়ে দে তাহলে!

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে মধুময় হেসে বলল, ভয় পাচ্ছিস? তাহলে নেমে যা!

ধনা নেমেই ছুটতে লাগল এবং তক্ষুনি মিলিয়ে গেল মাঠের অন্ধকারে।

মধুময় ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে পাঁচ, এখান থেকে লাইট-হাউস পৌঁছাতে দু-তিন মিনিট লাগবে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের পাশ দিয়ে লাইটহাউসের গলিতে ঢুকতেই মধুময় দেখল সামনে প্রচুর ভিড়।

মধুময়ের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। এত ভিড় কেন? সিনেমা কি ভেঙে গেছে? তা তো হতেই পারে না। ইংরেজি সিনেমা অনেক সময় তাড়াতাড়ি ভাঙে, কিন্তু ছবিটা অনেক বড়, শেষ হবে আটটা কুড়িতে। ধনা আগে থেকে খোঁজখবর নিয়ে গেছে।

মধুময় একটা দিক শুধু খেয়াল করে নি। ধনারও মনে পড়ে নি এ কথা। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে মিনিট পনেরো আগেই হল থেকে বেরিয়ে এসেছে লোক।

মধুময় মেল ট্রেনের চেয়েও দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। এখন সে কী করবে? এখান থেকে গাড়ি ঘোরাবার উপায় নেই। মধুময় পিছন দিকে তাকাল। পিছনে গাড়ি এসে গেছে, সে ব্যাক করেও পালাতে পারবে না। এগিয়ে যেতে হবে সামনেই। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্য দিয়ে···সে ধরা পড়ে যাবে···সে ধরা পড়ে যাবে···মধুময় প্রচণ্ড জোরে হর্ণ বাজাল।

কিন্তু ভিড় সরে গেল না। মধুময়ের মনে হল, সমস্ত লোকজন যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। যেন এক হিংস্র জনতা, আর

প্রত্যেকেরই হাতে অস্ত্র। মধুময়ের সমস্ত শরীর কাঁপছে, শিরাগুলো যেন ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলছে। স্টীয়ারিংটা জোরে চেপে ধরল মধুময়। সে ঠিক করল, সে থামবে না, সে এই সমস্ত লোককে চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কিংবা গাড়িটা এরোপ্লেনের মতন লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নেওয়া যায় না? মধুময় থামবে না, কিছুতেই থামবে না···

মধুময় দরজা লক করে দিল, কিন্তু কাচটা তোলার সময় পেল না তার আগেই জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল অনেকগুলো হাত। একজন হিন্দীতে চেঁচিয়ে উঠল, এহি আদমি···

মধুময় কোন কিছু কথা বলার সুযোগ পেল না। তার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নামানো হল বাইরে। অন্যান্য গাড়ির ড্রাইভাররাই বেশি হিংস্র ভাবে এগিয়ে এলো তাকে মারবার জন্য। বিরাট একটা শোরগোল চ্যাঁচামেচির মধ্যেও যেন খুব সরু গলায় দু-একবার শোনা গেল, না—না—না— !

সকলেই তার মাথা লক্ষ্য করে মারতে চায়। মধুময় এক হাতে মুখ চাপা দিয়ে আর এক হাতে মার ঠেকাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একসঙ্গে অনেকে মিলে কিল ঘুষি চালানোয় মধুময় পা সোজা রাখতে পারল না। পড়ে গেল মাটিতে।

দু-একজন ড্রাইভার লোহার হ্যাণ্ডেলও হাতে নিয়েছে।

শুয়ে থাকা অবস্থায় বেশীক্ষণ পড়ে থাকলে মার খেতে খেতে ওখানেই মরে যেত মধুময়। কলকাতার মানুষ মারতে ভালোবাসে। এই রকম সময় অনেকের মধ্যেই এসে যায় খুন করার নেশা। কত লোকের কত ব্যাপারে রাগ জমে থাকে, সেই সব রাগ একসঙ্গে দপ করে জ্বলে ওঠে আগুনের মতন। সবাই মিলে একজনকে খুন করলে কারুর মনেই খুনের অপরাধ লাগে না।

কিন্তু সে কিছুতেই জ্ঞান হারাবে না। ঐ অবস্থাতেও সে যেন জপ করার মতন বলতে লাগল, আমি মরব না—আমি মধুময়—আমি বেঁচে থাকব।

ঠিক কোন আরণ্যক প্রাণীর মতন মধুময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর গাছপালা ভেদ করার মতন সে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুঁ দিয়ে ছুটল, দু'হাতে মুখ ঢাকা। কেউ আটকাতে পারল না তাকে। কয়েকজন তাড়া করে এলো অনেকটা। কিন্তু তার আগেই সে নিউ মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

নিউ মার্কেটের মধ্যেও কত মানুষ। সবাই যেন মধুময়ের শত্রু। মধুময় মাথা খারাপ বেড়ালের মতন ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক। তারপর অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে আবার ছুটল।

দৌড়তে দৌড়তে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট পার হয়ে একটা ছোট পার্কে ঢুকে পড়ে জিরোতে লাগল মধুময়। একটুক্ষণ দম নেবার পর সে মিলিয়ে দেখতে লাগল তার শরীরের সব ক'টা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কি না। দুটো চোখ, দুটো কান, একটা নাক, দুটো হাত, দুটো পা -সব ঠিকই আছে। তবে দাঁত নেই ক'টা, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তখনও। দামী কোটটা ধুলো রক্তে মাখামাখি। ঠোঁট ফুলে গেছে, মাথার পিছন দিকটায় দারুন ব্যথা।

ধনা ঠিকই বলেছিল, গাড়িটা ফেরৎ দিতে যাওয়া ঠিক হয় নি। মাঠের মধ্যে ফেলে রাখলেই হত। মানুষের উপকার করতে নেই। সিনেমা দেখার পর লোকটার বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে, সঙ্গে হয়তো কেউ-টেউ আছে—এই ভেবেই···।

কিন্তু চোরাই গাড়ির ডেলিভারি ব্যবসায় নেমে এ সব কথা ভাবতে নেই, বুঝলে মধুময়। মধুময় নিজেকে এই কথা বলল। আর কয়েকদিন পর আমি এ সব আর একদম ভাবব না। প্রত্যেক দিন অন্তত দুখানা করে গাড়ি হাওয়া করে দেব!

গাড়ি চুরি করা সহজ, ফেরৎ দেওয়া কঠিন। মধুময় আর কোন দিন এই রকম পাগলামি করবে না। আজকের মার খাওয়ার ঘটনাটা চেপে যেতে হবে, ধনা যেন জানতে না পারে।

কোটটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল মধুময়। গলা থেকে টাইটাও খুলে ফেলল। এ সব আর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

পার্কের মধ্যের ছোট পুকুরটায় নেমে বেশ ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে নিল সে। একটা চিরুনি থাকলে ভালো হত, আঙুলগুলোই চিরুনির মতন করে চালিয়ে দিল চুলের মধ্যে।

ওপরে উঠে এসে কলকাতা শহরটাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, আর দু'দিন অপেক্ষা কর, তারপর মধুময় দত্ত দেখিয়ে দেবে সে কী! কেউ তার চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না। সে সারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে!

মধুময় বাড়ি ফিরল রাত প্রায় এগারোটায়। দেরি হলে, খাবার ঘরে ভাত ঢাকা থাকে। সে ভেবেছিল অন্য সবাই শুয়ে পড়লে সে চুপি চুপি ঢুকে পড়বে নিজের ঘরে। কিন্তু মা জেগে বসে আছেন খাওয়ার ঘরে। একা।

মধুময়কে দেখেই মা উঠে দাঁড়িয়ে ভীত গলায় বললেন, তুই এত দেরি করে ফিরলি! এদিকে আমি চিন্তায় চিন্তায় মরছি।

মধুময় মুখের কাছে হাত চাপা দিয়ে আছে। যাতে মা তার ফোলা ঠোঁটটা দেখতে না পান।

স্বপ্না সেই কখন থেকে বসে আছে তোর জন্যে—

মধুময় চমকে উঠল। স্বপ্না? এত রাত্তিরে স্বপ্না? সে তো অনেক দিন বাড়িতে আসেই না।—স্বপ্না?

হ্যাঁ! ওর কি হয়েছে?

তা আমি জানব কি করে?

আমায় কিছুই বলছে না। কাঁদছিল। তারপর বলল, তোর সঙ্গে দেখা না করে ও কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না।

ভুরুর কাছেও চোট লেগেছে, তাই ভুরু কোঁচকাতে গিয়ে মধুময়ের ব্যথা লাগল। মধুময় ভেবে পেল না স্বপ্না কেন এসেছে। স্বপ্না কি কোন বিপদে পড়ে তার সাহায্য চায়? অথচ, স্বপ্নাই সেদিন বলেছিল, সে আর মধুময়ের মুখ দেখতে চায় না। সে পছন্দ করে না মধুময়ের পাহারাদারি।

মধুময় তো আজ সারা রাত বাড়িতে না-ও ফিরতেও পারত। তা হলে কি স্বপ্না তার জন্য অপেক্ষা করত সারারাত?

মধুময় নিজের ঘরের দিকে এগোতেই মা সঙ্গে এলেন। মধুময় বলল, তুমি একটু এখানে বস। আমি আগে একটু আলাদা কথা বলে দেখি।

মা এতক্ষণ পর মধুময়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোর মুখের এ কি চেহারা হয়েছে?

ও কিছু না।

ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল মধুময়। না, স্বপ্না এখন আর কান্নাকাটি করছে না। একটা বই খুলে বসে আছে চোখের সামনে।

মধুময়ের এখন আর বুক কাঁপছে না। স্বপ্নাকে সে মন থেকে মুছে ফেলেছে। তার জীবনে আর স্বপ্নার প্রয়োজন নেই।

কী খবর? তুমি এত রাত্তিরে?

স্বপ্না উঠে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এটাও কি মধুময়কে চমকে দেবার জন্য? বাড়ির লোক নিশ্চয়ই কিছু ভাববে। এত রাত্রে স্বপ্না মধুময়কে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। সেই নীতি-বাতিকগ্রস্ত স্বপ্না!

স্বপ্না বলল, আমি সন্ধ্যের শো-তে লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

এবার মধুময়ের না চমকে উপায় নেই। স্বপ্না তাহলে নিজের কোন প্রয়োজনে আসে নি? স্বপ্না খুবই অহঙ্কারী, সে কোন প্রয়োজনের জন্য মধুময়ের কাছে সাহায্য চাইতে আসবে না।

মধুময়ও স্বপ্নার কথায় গুরুত্ব না দেবার জন্য বলল, সেখানে আমি অবশ্য তোমায় অনুসরণ করে যাই নি। আমি কথা দিলে কথা রাখি।

স্বপ্না বলল, আমার নিয়তিই বোধ হয় আমাকে আজ সন্ধ্যোবেলা ওখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

মধুময় ঠাট্টার সুরে বলল, তাই নাকি? আমি নিয়তি মানি না।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, উত্তর দেবে?

বল।

তুমি সেদিন বলেছিলে, এরপর থেকে তুমি অন্য জীবন শুরু করবে। সে কি এই জীবন?

একটুও দ্বিধা না করে মধুময় বলল, হ্যাঁ।

স্বপ্না হঠাৎ বসে পড়ল মধুময়ের পায়ের কাছে। মধুময়ের হাঁটু চেপে ধরে বলল, আর একটা কথা শুধু বলব··· সুরজিৎ দু'বার আমাকে চুমু খেয়েছে। আমি বাধা দিই নি, সেজন্য তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে?

আজ অনেকগুলো চমকাবার অস্ত্র নিয়ে এসেছে স্বপ্না। মধুময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে একেবারে। এ তো অন্য রকম স্বপ্না! একে যেন মধুময় চেনেই না!

সুরজিৎ তোমায় ভালোবাসে, সে তো তোমায় চুমু খেতেই পারে। এতে দোষের কী আছে?

আমি ওকে ভালোবাসি না। আমি ভুল করেছি। একবার ভুল করলে কী ক্ষমা করা যায় না? তোমার কাছ থেকে এর উত্তর না জেনে আমি ফিরবই না।

মধুময় বলল, এ সব গোলমেলে কথা তুলে আর লাভ কী? তুমি মুক্তি চেয়েছিলে, আমি মুক্তি দিয়েছি তোমায়। আর তো ক্ষমা-টমার প্রশ্নই ওঠে না।

স্বপ্না বলল, আমি মুক্তি কাকে বলে জানি না। আমাকে মুক্তি দেওয়া মানে কি ভুল জায়গায় ঠেলে দেওয়া?

সুরজিৎ খুব ভালো ছেলে।

হোক ভালো। কিন্তু ওর কাছে তো আমার আত্মার কোন অংশ জমা নেই।

আমার কাছে আছে নাকি?

তুমি জানো না!

আমি যদি লাইটহাউস সিনেমায় না গিয়ে এলিট সিনেমায় যেতাম, তাহলে আর তুমি নিশ্চয়ই আজ আমার কাছে আসতে না। উঠে দাঁড়াও!

তুমি আগে বল, আমায় ক্ষমা করবে কি না? বল, বল, বল, বল—

মধুময় ক্ষীণ ভাবে হাসল। তারপর নীচু হয়ে স্বপ্নার দু'হাত ধরে বলল, ওঠ। তুমি ঠিকই বলছ, নিয়তিই বোধ হয় আজ সন্ধেবেলা আমাদের দুজনকে এক জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

———